পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তির মহিমা

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া ।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক বললেন; **কপিলঃ**—কপিলদেব; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **সংখ্যাতা**—বিশ্লেষণকারী; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **জাতঃ**—জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অজঃ**—জন্ম-রহিত; **সাক্ষাৎ**—ব্যক্তিগতভাবে; **আত্ম-প্রজ্ঞপ্তয়ে**—দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য; **নৃণাম্**—মানব-জাতির জন্য।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কপিল মুনি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণার্থে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবান মানব-জাতির মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য অবতরণ করেন। বৈদিক জ্ঞানে জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছে, যা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়ার কর্মসূচী প্রদান করে। সত্ত্বগুণে মানুষের জ্ঞান বিস্তৃত হয়। রজোগুণের স্তরে কোন জ্ঞান নেই, কেননা রজোগুণ মানে হচ্ছে কেবল জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করা, আর তমোগুণের স্তরে কোন জ্ঞান নেই এবং কোন ভোগও নেই; সেই জীবন ঠিক একটি পশু-জীবনের মতো।

বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত করা। কেউ যখন সত্ত্বগুণের স্তরে স্থিত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। এই জ্ঞান সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না। যেহেতু এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গুরু-পরম্পরার প্রয়োজন হয়, তাই এই জ্ঞান হয় স্বয়ং ভগবান কর্তৃক অথবা তাঁর প্রামাণিক ভক্তের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। শৌনক মুনিও এখানে উল্লেখ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীকপিলদেব দিব্য জ্ঞান বিশ্লেষণ এবং বিতরণ করার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অথবা আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি জড় পদার্থ নই, আমি চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি ব্রহ্ম') এইটুকু জ্ঞান আত্মা এবং তার কার্যকলাপ জানার জন্য যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মের কার্যকলাপে স্থিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেই সমস্ত কার্যকলাপের জ্ঞান ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রকার অপ্রাকৃত জ্ঞানের মর্ম কেবল মানুষেরাই উপলব্ধি করতে পারে, পশুরা পারে না, যা *নৃণাম্*, 'মানুষদের জন্য' শব্দটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করা। পশু-জীবনেও প্রকৃতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তবে তা শাস্ত্রে এবং মহাজনগণ কর্তৃক বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত জীবনের মতো নয়। মানব-জীবন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, পশুদের জীবন নয়। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেই কেবল দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ২

ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্নঃ সর্বযোগিনাম্ ।
বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥ ২ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তাঁর বিষয়ে; **বর্ষ্মণঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষদের মধ্যে; **বরিম্নঃ**—সর্বাগ্রগণ্য; **সর্ব**—সমস্ত; **যোগিনাম্**—যোগীদের মধ্যে; **বিশ্রুতৌ**—শ্রবণে; **শ্রুত-দেবস্য**—বেদের প্রভু; **ভূরি**—বারংবার; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **মে**—আমার; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

শৌনক বলতে লাগলেন—এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের থেকে বেশি জানেন। তাঁর থেকে অধিক পূজনীয় অথবা তাঁর থেকে উত্তম যোগী কেউ নেই। তাই তিনিই হচ্ছেন বেদের প্রভু, এবং সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলেই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউই ভগবানের সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়। বেদেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি অন্য সমস্ত জীবেদের প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন। এইভাবে অন্য সমস্ত জীবসমূহ, বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব উভয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্ব। সেই ধারণাই এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *ন হ্যস্য বর্ত্মণঃ পুংসাম্*—সমস্ত জীবেদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারেন, কেননা তাঁর থেকে অধিক ঐশ্বর্যশালী, অধিক যশস্বী, অধিক শক্তিশালী, অধিক সুন্দর, অধিক জ্ঞানবান এবং অধিক ত্যাগী আর কেউ নেই। এই সমস্ত গুণের প্রভাবে তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। যোগীরা নানা রকম আশ্চর্য ধরনের ভেলকিবাজি দেখিয়ে গর্ববোধ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের কারোরই কোন তুলনা হয় না।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে স্বীকার করা হয়। ভক্তেরা ভগবানের মতো শক্তিশালী না হতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর সঙ্গ করার ফলে, তাঁরা ভগবানেরই মতো হয়ে যান। কখনও কখনও ভক্তেরা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তি প্রদর্শন করেন। অবশ্যই, তা ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হয়।

এখানে *বরিষ্ঠঃ* শব্দটিরও ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত যোগীদের মধ্যে সব চাইতে পূজনীয়'। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করাই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত সুখ; তাই তাঁকে বলা হয় গোবিন্দ, কেননা তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশের দ্বারা—তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর দ্বারা—তিনি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন। তিনি যে উপদেশই দেন, তা চিন্ময় স্তর থেকে, এবং তাঁর উপদেশ পরম হওয়ার ফলে, তাঁর থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করা অথবা তাঁর অংশ বা কপিলদেবের মতো তাঁর অংশের অংশ থেকে শ্রবণ করা ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। *ভগবদ্গীতা* বহুবার শ্রবণ করা বা পাঠ করা যায়, কেননা তা এক পরম আনন্দ প্রদানকারী গ্রন্থ, তাই *ভগবদ্গীতা* যতই পাঠ করা হয়, ততই তা পাঠ করার এবং বুঝবার তৃষ্ণা বর্ধিত হয়, এবং তার ফলে পাঠক নিত্য নতুন উপলব্ধি লাভ করেন। চিন্ময় বাণীর সেটিই হচ্ছে স্বভাব। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠেও সেই রকম দিব্য আনন্দ লাভ হয়। আমরা যতই ভগবানের মহিমা শ্রবণ করি এবং কীর্তন করি, ততই আমরা আনন্দিত হই।

শ্লোক ৩

যদ্‌যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া ।
তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্তন্যান্যনুকীর্তয় ॥ ৩ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **বিধত্তে**—তিনি অনুষ্ঠান করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-ছন্দ-আত্মা**—আত্ম বাসনায় পূর্ণ; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **তানি**—সেই সমস্ত; **মে**—আমাকে; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাবান; **কীর্তন্যানি**—প্রশংসার যোগ্য; **অনুকীর্তয়**—কৃপা করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

তাই কৃপা করে স্বচ্ছন্দ আত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ এবং লীলাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

অনুকীর্তয় শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অনুকীর্তয়* মানে হচ্ছে মনগড়া ধারণা থেকে বর্ণনা না করে, যথাযথ বর্ণনার অনুসরণ করা। শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেভাবে তাঁর গুরুদেব শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত চিন্ময় লীলা-বিলাসের যে-সমস্ত বর্ণনা শুনেছিলেন, ঠিক সেইভাবে যেন তিনি সেইগুলি বর্ণনা করেন। পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় শরীর নেই, কিন্তু তিনি তাঁর পরম ইচ্ছা অনুসারে, যে-কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। তা সম্ভব হয় তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা ।
প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **দ্বৈপায়ন-সখঃ**—ব্যাসদেবের সখা; **তু**—তার পর; **এবম্**—এইভাবে; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয়; **ভগবান্**—পূজনীয়; **তথা**—সেইভাবে;

প্রাহ—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **আন্বীক্ষিক্যাম্**—দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে; **প্রচোদিতঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরম শক্তিমান ঋষি মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নে অনুপ্রাণিত এবং প্রসন্ন হয়ে, মৈত্রেয় এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন প্রশ্নকর্তা ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী হন এবং বক্তা ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা হন, তখন প্রশ্নোত্তর অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে চলতে থাকে। এখানে মৈত্রেয়কে একজন শক্তিশালী ঋষি বলে বিবেচনা করে, ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই নয়, যাঁরা প্রায় ভগবানেরই মতো শক্তিমান তাঁদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। মৈত্রেয়কে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেননা পারমার্থিক স্তরে তিনি অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদিক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ভগবানের অবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সখা। বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কেননা সেই প্রশ্নগুলি ছিল তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী উন্নত ভক্তের প্রশ্ন। তাই মৈত্রেয় সেইগুলির উত্তর দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যখন চিন্ময় বিষয়ে সমান মানসিকতাসম্পন্ন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা হয়, তখন প্রশ্ন ও উত্তর অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **পিতরি**—যখন তাঁর পিতা; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **অরণ্যম্**—বনে; **মাতুঃ**—তাঁর মাতা; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—প্রসন্নতা বিধানের বাসনায়; **তস্মিন্**—সেই; **বিন্দুসরে**—বিন্দু-সরোবরে; **অবাৎসীৎ**—তিনি অবস্থান করেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **কপিলঃ**—কপিল; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—কর্দম যখন বনে প্রস্থান করেছিলেন, তখন ভগবান কপিল তাঁর মাতা দেবহূতির প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পিতার অনুপস্থিতিতে বয়স্ক পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে মায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা এবং তাঁর যথাসাধ্য সেবা করা, যাতে তিনি তাঁর পতির বিচ্ছেদ অনুভব না করেন, আর পতির কর্তব্য হচ্ছে বয়স্ক পুত্র তাঁর পত্নী এবং গৃহস্থালির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া মাত্রই গৃহত্যাগ করা। এইটি হচ্ছে বৈদিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রথা। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গৃহের ব্যাপারে নিরন্তর যুক্ত থাকা মানুষের উচিত নয়। গৃহ ত্যাগ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। পারিবারিক বিষয় এবং পত্নীর দায়-দায়িত্ব উপযুক্ত পুত্র গ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ৬

তমাসীনমকর্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ ।
স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥ ৬ ॥

তম্—তাঁকে (কপিল); **আসীনম্**—অবস্থিত; **অকর্মাণম্**—কর্মমুক্ত অবস্থায়; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্বের; **মার্গ-অগ্র**—অন্তিম লক্ষ্য; **দর্শনম্**—যিনি দেখাতে পারেন; **স্ব-সুতম্**—তাঁর পুত্র; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি; **আহ**—বলেছিলেন; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **সংস্মরতী**—স্মরণ করে; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

পরমতত্ত্বের চরম লক্ষ্যের মার্গ প্রদর্শক কপিলদেব যখন কর্মে নিরত হয়ে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবহূতি ব্রহ্মার বাণী স্মরণ করে তাঁকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৭

দেবহূতিরুবাচ

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; নির্বিণ্ণা—বিরক্ত হয়ে; নিতরাম্—অত্যন্ত; ভূমন্—হে প্রভো; অসৎ—অনিত্য; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহের; তর্ষণাৎ—উত্তেজনা থেকে; যেন—যার দ্বারা; সম্ভাব্যমানেন—সঙ্গ হওয়ার ফলে; প্রপন্না—আমি পতিত হয়েছি; অন্ধম্ তমঃ—অন্ধকূপে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো! আমি আমার অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-অভিলাষ থেকে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি তমসাবৃত সংসার-কূপে পতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অসৎ মানে হচ্ছে 'অনিত্য', এবং ইন্দ্রিয় মানে হচ্ছে 'জড় ইন্দ্রিয়সমূহ'। অতএব অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ মানে হচ্ছে 'জড় দেহের অনিত্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা লুব্ধ হয়ে'। আমরা জড় দেহের বিভিন্ন স্তর থেকে বিকশিত হচ্ছি—কখনও মানব-শরীরে, কখনও পশু-শরীরে, এবং তাই আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন হচ্ছে। যা পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় অসৎ। আমাদের জানা উচিত যে, এই অনিত্য ইন্দ্রিয়ের অতীত রয়েছে আমাদের নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ, যা এখন জড় শরীরের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে। শাশ্বত ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের দ্বারা কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে, যথাযথভাবে ক্রিয়া করছে না। তাই, ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে এই কলুষ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে মুক্ত করার পন্থা। সেই কলুষ যখন সর্বতোভাবে অপসারিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন অনন্য কৃষ্ণভক্তির শুদ্ধতায় সক্রিয় হয়, তখন আমরা সদিন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের শাশ্বত ক্রিয়ার স্তর প্রাপ্ত হই। শাশ্বত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি, কিন্তু অনিত্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে বলা হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। যতক্ষণ না মানুষ জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় শ্রান্ত হয়, ততক্ষণ কপিলদেবের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হতে পারে না। দেবহূতি বলেছিলেন যে তিনি শ্রান্ত। এখন যেহেতু তাঁর পতি গৃহত্যাগ করেছেন, তাই তিনি কপিলদেবের উপদেশ শ্রবণ করে, ত্রাণ লাভ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্ ।
সচ্চক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

তস্য—সেই; ত্বম্—আপনি; তমসঃ—অজ্ঞান; অন্ধস্য—অন্ধকার; দুষ্পারস্য—অতিক্রম করা দুষ্কর; অদ্য—এখন; পারগম্—পার হয়ে; সৎ—চিন্ময়; চক্ষুঃ—নেত্র; জন্মনাম্—জন্মের; অন্তে—শেষে; লব্ধম্—প্রাপ্ত হয়েছি; মে—আমার; ত্বৎ-অনুগ্রহাৎ—আপনার কৃপায়।

অনুবাদ

হে ভগবান! অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনিই আমার একমাত্র উপায়, কেননা আপনি হচ্ছেন আমার দিব্য নেত্র, যা আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমি লাভ করেছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ, কেননা তা গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে। শিষ্য অথবা বদ্ধ জীব অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং তাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়েছে। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কপিল মুনি অথবা তাঁর প্রতিনিধির মতো সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করেন, তা হলে তাঁর কৃপায় অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে তিনি উদ্ধার লাভ করতে পারেন। তাই গুরুদেবের পূজা করা হয়, যিনি তাঁর শিষ্যকে জ্ঞানরূপ আলোকবর্তিকার দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন। পারগম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, যিনি তাঁর শিষ্যকে অপর পারে নিয়ে যেতে পারেন। এই পারে বদ্ধ জীবন এবং অন্য পারে মুক্ত জীবন। গুরুদেব জ্ঞানের আলোকের দ্বারা তাঁর শিষ্যের চক্ষু উন্মীলিত করে তাকে অপর পারে নিয়ে যান। আমরা কেবল আমাদের অজ্ঞানতাবশত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। সদ্গুরুর উপদেশের দ্বারা সেই অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, এবং তার ফলে শিষ্য অপর পারে গিয়ে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। তেমনই, কেউ যদি বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর সদ্গুরুর সন্ধান পান এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই আদর্শ প্রতিনিধির শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি জ্যোতির্ময় অপর পারে পৌঁছাতে পারবেন।

শ্লোক ৯

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল ।
লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য ইবোদিতঃ ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি; **আদ্যঃ**—আদি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুংসাম্**—সমস্ত জীবেদের; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **বৈ**—বাস্তবিকই; **ভবান্**—আপনি; **কিল**—অবশ্যই; **লোকস্য**—বিশ্বের; **তমসা**—অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারা; **অন্ধস্য**—অন্ধ; **চক্ষুঃ**—নেত্র; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ইব**—মতো; **উদিতঃ**—উদিত হয়েছেন।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সমস্ত জীবের আদি এবং অধীশ্বর। সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য, আপনি সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কপিল মুনিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। এখানে *আদ্যঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত জীবের আদি', এবং *পুংসাম্ ঈশ্বরঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত জীবের ঈশ্বর' (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*)। চিন্ময় জ্ঞানরূপী সূর্য-স্বরূপ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রকাশ হচ্ছেন কপিল মুনি। সূর্য যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূর করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আলোক যখন নেমে আসে, তখনই মায়ার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ ব্যতীত আমাদের চক্ষুর কোন মূল্য নেই। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আলোক ব্যতীত বা সদ্গুরুর দিব্য কৃপা ব্যতীত, কোন বস্তুই আমরা যথাযথভাবে দর্শন করতে পারি না।

শ্লোক ১০

অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি ।
যোঽবগ্রহোঽহংমমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥ ১০ ॥

অথ—এখন; **মে**—আমার; **দেব**—হে ভগবান; **সম্মোহম্**—মোহ; **অপাক্রষ্টুম্**—দূর করার জন্য; **ত্বম্**—আপনি; **অর্হসি**—প্রসন্ন হোন; **যঃ**—যা; **অবগ্রহঃ**—ভ্রান্ত ধারণা; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **ইতি**—এইভাবে; **এতস্মিন্**—এতে; **যোজিতঃ**—যুক্ত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার মহা মোহ দূর করুন। আমার অহঙ্কারের ফলে, আমি আপনার মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়েছি, এবং আমার দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করছি।

তাৎপর্য

দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করার ভ্রান্ত পরিচিতিকে বলা হয় *মায়া*। *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং আমার থেকেই সকলের স্মৃতি এবং বিস্মৃতি আসে।" দেবহূতি উল্লেখ করেছেন যে, দেহতে আত্মবুদ্ধি এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুতে মমত্ব-বুদ্ধি—এই যে ভ্রান্ত ধারণা, তাও ভগবানেরই নির্দেশে হয়। তা হলে তার অর্থ কি এই হচ্ছে যে, ভগবান একজনকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করে এবং অন্য আর একজনকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে আসক্ত করে তাঁর ভেদভাব প্রদর্শন করেন? তা যদি সত্য হয়, তা হলে ভগবানের পক্ষে তা বেমানান হবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়। জীব যখনই ভগবানের নিত্য দাসরূপে তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে চায়, তৎক্ষণাৎ *মায়া* তাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ার এই বন্ধন হচ্ছে দেহতে আত্মবুদ্ধি এবং দেহের অধিকৃত বস্তুতে আসক্তি। এইগুলি হচ্ছে মায়ার কার্য, এবং যেহেতু মায়া হচ্ছে ভগবানেরই প্রতিনিধি, তাই পরোক্ষভাবে তা ভগবানেরই ক্রিয়া। ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়; কেউ যদি তাঁকে ভুলে জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তিনি তাকে তখন সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেন—প্রত্যক্ষভাবে নয়, তাঁর জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে। তাই, জড়া প্রকৃতি যেহেতু ভগবানেরই শক্তি, পরোক্ষভাবে ভগবানই তাকে ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেন। দেবহূতি তাই বলেছেন, "ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় আমি যে যুক্ত হয়েছি, তাও আপনারই জন্য। এখন দয়া করে আপনি আমাকে এই বন্ধন থেকে মুক্ত করুন।"

ভগবানের কৃপায় জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই জড় সুখভোগের প্রতি কেউ যখন নিরাশ হয়ে বিরক্ত হয়, এবং ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়, তখন কৃপাময় ভগবান তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাই, *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "প্রথমে তুমি আমার শরণাগত হও, এবং তার পর আমি তোমার দায়িত্বভার গ্রহণ করব এবং তোমার সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।" পাপ কর্ম হচ্ছে সেই সমস্ত কার্যকলাপ, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে আমরা সম্পাদন করি। এই জগতে, জড় সুখভোগের জন্য যে-সমস্ত কর্মকে পুণ্য কর্ম বলে মনে করা হয়, তাও পাপময়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, কখনও কখনও মানুষ কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই মনে করে দান করে যে, তার বিনিময়ে তার চারগুণ ধন লাভ হবে। লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে দান করা হয়, তা রাজসিক। এখানে

সব কিছুই করা হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে, এবং তাই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য সব কিছুই পাপময়। পাপ কর্মের ফলে আমরা জড় আসক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে মনে করি, "এই দেহটি আমি" এবং দেহের অধিকৃত সমস্ত বস্তুকে মনে করি "আমার"। কপিলদেবের কাছে দেবহূতি অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁকে এই ভ্রান্ত পরিচিতি এবং ভ্রান্ত অধিকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ১১

তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্ ।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পূরুষস্য
নমামি সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

তম্—সেই ব্যক্তি; **ত্বা**—আপনাকে; **গতা**—গিয়েছি; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **স্ব-ভৃত্য**—আপনার আশ্রিত জনের; **সংসার**—জড় অস্তিত্বের; **তরোঃ**—বৃক্ষের; **কুঠারম্**—কুঠার; **জিজ্ঞাসয়া**—জানবার বাসনায়; **অহম্**—আমি; **প্রকৃতেঃ**—জড় পদার্থের (স্ত্রী); **পূরুষস্য**—আত্মার (পুরুষ); **নমামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **সৎ-ধর্ম**—শাশ্বত বৃত্তির; **বিদাম্**—জ্ঞাতাদের; **বরিষ্ঠম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

দেবহূতি বলতে লাগলেন—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, কেননা আপনিই একমাত্র শরণ্য। আপনি সেই কুঠার, যার দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা যায়। আমি তাই আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি, কেননা আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে জানতে চাই।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শন প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয়ে আলোচনা করে। পুরুষ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান অথবা যে ভোক্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করে, আর প্রকৃতি মানে হচ্ছে 'শক্তি'। এই জড় জগতে, জড়া প্রকৃতি পুরুষ বা ভোক্তাদের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জড় জগতে প্রকৃতি এবং পুরুষ, অথবা ভোক্তা এবং ভোগ্যের যে জটিল সম্পর্ক, তাকে বলা হয় সংসার বা ভব-বন্ধন। দেবহূতি ভৌতিক বন্ধনরূপী বৃক্ষটিকে কাটতে চেয়েছেন, এবং তিনি সেই জন্য কপিল

মুনিরূপ কুঠার প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সংসাররূপী বৃক্ষটির বিশ্লেষণ করে, ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেইটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো যার মূল ঊর্ধ্বমুখী এবং শাখাগুলি অধোমুখী। সেখানে বলা হয়েছে যে, সংসাররূপী সেই বৃক্ষটির মূল ছেদন করতে হয় বিরক্তিরূপ কুঠারের দ্বারা। আসক্তি কি? আসক্তি হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক। জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছে। যেহেতু বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতিকে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তু বলে মনে করছে এবং নিজে ভোক্তা সাজছে, তাই তাকে বলা হয় পুরুষ।

দেবহূতি কপিল মুনিকে প্রশ্ন করেছেন, কেননা তিনি জানতেন যে, জড় জগতের প্রতি তাঁর আসক্তি ছেদন করতে তিনিই কেবল পারেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর বেশে জীবাত্মা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার চেষ্টা করছে; তাই এক বিচারে সকলেই পুরুষ, কেননা পুরুষ মানে হচ্ছে 'ভোক্তা' এবং প্রকৃতি মানে হচ্ছে 'ভোগ্য'। এই জড় জগতে তথাকথিত পুরুষ এবং তথাকথিত স্ত্রী উভয়েই প্রকৃত পুরুষের অনুকরণ করছে; আধ্যাত্মিক বিচারে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা, এবং অন্য সকলেই হচ্ছে প্রকৃতি। জীবেদের প্রকৃতি বলে বিবেচনা করা হয়; ভগবদ্গীতায় জড় জগৎকে অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে, তা হচ্ছে জীবাত্মা। জীবাত্মারাও প্রকৃতি, বা ভোগ্যা, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবেরা ভ্রান্তিবশত ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটিই হচ্ছে সংসার-বন্ধনের কারণ। দেবহূতি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হতে চেয়েছিলেন। ভগবান হচ্ছেন শরণ্য, অর্থাৎ একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া যায়, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। কেউ যদি মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁর শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানকে এখানে *সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত সৎ ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবা। ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'যা কখনও ত্যাগ করা যায় না', 'যা জীবের থেকে অবিচ্ছেদ্য'। তাপকে আগুন থেকে পৃথক করা যায় না; তাই তাপ হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনই সদ্ধর্ম মানে হচ্ছে '*নিত্য বৃত্তি*'। সেই নিত্য বৃত্তিটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। কপিলদেবের সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুদ্ধ নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা, এবং তাই তাঁকে জীবেদের চিন্ময় ধর্ম-তত্ত্ববেত্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ
ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং
নিশম্য পুংসামপবর্গবর্ধনম্ ।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **নিরবদ্যম্**—নিষ্কলুষ; **ঈপ্সিতম্**—বাসনা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **পুংসাম্**—মানুষের; **অপবর্গ**—দৈহিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি; **বর্ধনম্**—বৃদ্ধি করে; **ধিয়া**—মনের দ্বারা; **অভিনন্দ্য**—ধন্যবাদ জানিয়ে; **আত্ম-বতাম্**—আত্ম উপলব্ধির বিষয়ে উৎসাহী; **সতাম্**—অধ্যাত্মবাদীদের; **গতিঃ**—পন্থা; **বভাষে**—তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন; **ঈষৎ**—অল্প; **স্মিত**—হেসে; **শোভিত**—সুন্দর; **আননঃ**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—তাঁর মায়ের অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিষ্কলুষ বাসনা শ্রবণ করে, ভগবান তাঁকে সেই প্রশ্ন করার জন্য অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে অধ্যাত্মবাদীদের মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর ভব-বন্ধনের কথা স্বীকার করে, এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। যাঁরা ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক এবং মানব-জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চান, তাঁদের জন্য কপিলদেবের নিকট দেবহূতির প্রশ্নগুলি অত্যন্ত রুচিকর। মানুষ যদি তার পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে অথবা তার স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী না হয়, এবং যদি সে তার জড় অস্তিত্বের অসুবিধাগুলি অনুভব না করে, তা হলে তার মানব-জন্ম বৃথা। যারা জীবনের এই পারমার্থিক আবশ্যকতাগুলির চেষ্টা না করে, কেবল একটি পশুর মতো আহার-নিদ্রা-ভয় এবং মৈথুনে লিপ্ত থাকে, তা হলে তাদের জীবন ব্যর্থ। ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতার প্রশ্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কেননা তার উত্তর জড় জগতে বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির বাসনা জাগরিত করে। এই প্রকার প্রশ্নগুলিকে বলা হয় *অপবর্গবর্ধনম্* । যাঁরা প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক বিষয়ে আগ্রহী, তাঁদের

বলা হয় সৎ বা ভক্ত। সতাং প্রসঙ্গাৎ। সৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যার শাশ্বত অস্তিত্ব রয়েছে' আর অসৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যা শাশ্বত নয়'। পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, কেউ সৎ হতে পারে না; সে অসৎ। অসৎ এমন একটি স্তরে থাকে, যার অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু যিনি চিন্ময় স্তরে রয়েছেন, তিনি চিরকাল থাকবেন। চিন্ময় আত্মারূপে সকলেরই অস্তিত্ব নিত্য, কিন্তু যারা অসৎ তারা এই জড় জগৎকে তাদের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছে, এবং তাই তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। অসদ্গ্রহান্, জড় জগৎকে ভোগ করার মিথ্যা ধারণার ফলে, আত্মার অসঙ্গত অবস্থানই তার অসৎ হওয়ার কারণ। প্রকৃত পক্ষে আত্মা অসৎ নয়। কেউ যখন সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সৎ হয়ে যান। সতাং গতিঃ, নিত্যত্বের মার্গ, যা মুক্তিকামী ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর, এবং ভগবান কপিলদেব সেই পন্থা সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীভগবানুবাচ

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগঃ**—যোগের পন্থা; **আধ্যাত্মিকঃ**—আত্ম সম্পর্কীয়; **পুংসাম্**—জীবদের; **মতঃ**—সম্মত; **নিঃশ্রেয়সায়**—চরম মঙ্গলের জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **অত্যন্ত**—পূর্ণ; **উপরতিঃ**—বিরতি; **যত্র**—যেখানে; **দুঃখস্য**—দুঃখ থেকে; **চ**—এবং; **সুখস্য**—সুখ থেকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—যে যোগ-পদ্ধতি ভগবান এবং জীবের সম্পর্ক নির্ধারিত করে, যা জীবের চরম মঙ্গল সাধন করে, এবং যা জড়-জাগতিক সমস্ত সুখ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা।

তাৎপর্য

জড় জগতে, সকলেই জড় সুখ ভোগের চেষ্টা করছে, কিন্তু যখনই একটু সুখ লাভ হয়, তখন দুঃখও এসে উপস্থিত হয়। এই জড় জগতে কেউই অবিমিশ্র সুখভোগ করতে পারে না। এখানে সমস্ত সুখই দুঃখের দ্বারা কলুষিত হয়। দৃষ্টান্ত-

প্রকাশ বলা যায় যে, আমরা যদি দুধ পান করতে চাই, তা হলে আমাদের একটি গরু পালন করতে হবে এবং তাকে দুধ দেওয়ার উপযুক্ত করে রাখতে হবে। দুধ পান করা খুবই ভাল; তা আনন্দদায়কও। কিন্তু দুধ পান করার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। ভগবান এখানে যে যোগ-পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা সমস্ত জাগতিক সুখ এবং জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তি সাধনের জন্য। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হচ্ছে ভক্তিযোগ, যা ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। গীতায় এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করা এবং জড় সুখ অথবা দুঃখে বিচলিত না হওয়া। কেউ আবার বলতে পারেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখের দ্বারা বিচলিত হন না, কিন্তু তিনি জানেন না যে, তথাকথিত জড় সুখ ভোগ করার ঠিক পরে, জড় দুঃখ আসবে। এটিই হচ্ছে জড় জগতের নিয়ম। ভগবান কপিলদেব উল্লেখ করেছেন যে, যোগ-পদ্ধতি হচ্ছে আত্মার বিজ্ঞান। পারমার্থিক স্তরে সিদ্ধি লাভের জন্য মানুষ যোগ অনুশীলন করে। তাতে জড়-জাগতিক সুখ অথবা দুঃখের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তা চিন্ময়। ভগবান কপিলদেব ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে তা চিন্ময়, তবে প্রাথমিক পরিচয়টি এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে।
ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥ ১৪ ॥

তম্ ইমম্—সেই; **তে**—আপনাকে; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব; **যম**—যা; **অবোচম্**—আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম; **পুরা**—পূর্বে; **অনঘে**—হে পুণ্যবতী মাতা; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **শ্রোতু-কামানাম্**—শ্রবণ করতে উৎসুক; **যোগম্**—যোগ-পদ্ধতি; **সর্ব-অঙ্গ**—সর্বতোভাবে; **নৈপুণম্**—উপযোগী এবং ব্যবহারিক।

অনুবাদ

হে পরম পবিত্র মাতা! আমি পুরাকালে মহান ঋষিদের কাছে যে যোগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই প্রাচীন যোগের পন্থা আমি এখন আপনার কাছে বলব। এইটি সর্বতোভাবে উপযোগী এবং ব্যবহারিক।

তাৎপর্য

ভগবান কোন নতুন যোগের পন্থা তৈরি করেন না। কখনও কখনও দাবি করা হয় যে, কেউ ভগবানের অবতার হয়ে গেছে এবং পরমতত্ত্বের এক নতুন মতবাদ

প্রবর্তন করেছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও কপিল মুনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তিনি তাঁর মায়ের জন্য নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম, কিন্তু তবুও তিনি বলছেন, "আমি আপনার কাছে সেই প্রাচীন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করব, যা আমি মহর্ষিদের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলাম কেননা তাঁরা তা শ্রবণ করতে উৎসুক হয়েছিলেন।" যখন আমাদের কাছে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ইতিমধ্যেই রয়েছে, তখন আর নিরীহ জনসাধারণদের পথভ্রষ্ট করার জন্য নতুন কোন পন্থা তৈরি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আজকাল নতুন যোগ-পদ্ধতি আবিষ্কারের নামে আদর্শ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে, কতগুলি বাজে জিনিস উপস্থাপন করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ১৫

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্ ।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥

চেতঃ—চেতনা; **খলু**—নিশ্চয়ই; **অস্য**—তার; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—জীবের; **মতম্**—মনে করা হয়; **গুণেষু**—প্রকৃতির তিন গুণে; **সক্তম্**—আকৃষ্ট হয়ে; **বন্ধায়**—বদ্ধ জীবনের জন্য; **রতম্**—আসক্ত; **বা**—অথবা; **পুংসি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য।

অনুবাদ

যেই অবস্থায় জীবের চেতনা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধ জীবন। কিন্তু সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণচেতনা এবং মায়া-চেতনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গুণেষু বা মায়া-চেতনায় প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতি আসক্তি থাকে, যার ফলে মানুষ কখনও কখনও সত্ত্বগুণে, কখনও রজোগুণে এবং কখনও তমোগুণে কার্য করে। মুখ্যত জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে, এই সমস্ত বিভিন্ন গুণাত্মক কার্যকলাপই হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে স্থানান্তরিত করা হয়, অথবা যখন মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি মুক্তির পথে অধিষ্ঠিত হন।

শ্লোক ১৬

অহংমমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥

অহম্—আমি; **মম**—আমার; **অভিমান**—ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **উত্থৈঃ**—উৎপন্ন হয়; **কাম**—কাম; **লোভ**—লোভ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **মলৈঃ**—কলুষ থেকে; **বীতম্**—মুক্ত; **যদা**—যখন; **মনঃ**—মন; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **অদুঃখম্**—দুঃখ-রহিত; **অসুখম্**—সুখ-রহিত; **সমম্**—সাম্যভাব।

অনুবাদ

মানুষ যখন 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত পরিচিতি-প্রসূত কাম, লোভ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হন, তখন তাঁর মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি তথাকথিত জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হন।

তাৎপর্য

কাম এবং লোভ জড়-জাগতিক অস্তিত্বের লক্ষণ। সকলেই সর্বদা কিছু না কিছু পেতে চায়। এখানে বলা হয়েছে যে, দেহকে নিজের স্বরূপ বলে ভুল করার ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে কাম এবং লোভ উৎপন্ন হয়। কেউ যখন সেই কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন তার মন এবং চেতনাও মুক্ত হয়, এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। মন, চেতনা এবং জীব বিদ্যমান থাকে। যখনই আমরা জীবের কথা বলি, তখন তার সঙ্গে মন এবং চেতনা নিহিত থাকে। যখন আমরা আমাদের মন এবং চেতনাকে পবিত্র করি, তখনই বদ্ধ জীবন এবং মুক্ত জীবনের পার্থক্য দেখা যায়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, মানুষ জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হয়।

শুরুতেই কপিলদেব বলেছেন যে, প্রকৃত যোগ-পদ্ধতির দ্বারা মানুষ জড়-জাগতিক সুখ এবং দুঃখের স্তর অতিক্রম করতে পারে। তা কিভাবে সম্ভব তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তার মন এবং চেতনাকে পবিত্র করতে হয়। ভক্তিযোগের দ্বারাই তা সম্ভব। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করতে হয় (*তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। সেইটি হচ্ছে পন্থা। মনকে অবশ্যই কিছু না কিছু করতে হয়। মনকে কখনই খালি রাখা যায় না। কেউ

কেউ অবশ্য মূর্খের মতো মনকে খালি করতে অথবা শূন্য করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। মনকে পবিত্র করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করা। মনকে কিছু না কিছুতে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হয়। আমরা যদি আমাদের মনকে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করি, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই চেতনা পূর্ণরূপে পবিত্র হয়, এবং তখন আর তাতে জড় কাম এবং লোভ প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৭

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥

তদা—তখন; **পুরুষঃ**—জীবাত্মা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **প্রকৃতেঃ পরম্**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **নিরন্তরম্**—অভিন্ন; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং প্রকাশ; **অণিমানম্**—অণু-সদৃশ; **অখণ্ডিতম্**—অখণ্ড।

অনুবাদ

তখন জীবাত্মা অণু-সদৃশ হলেও নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত, জ্যোতির্ময়, অখণ্ডিতরূপে দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায়, মানুষ নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন এক সূক্ষ্ম কণারূপে দর্শন করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। সূর্যের কিরণ যেমন জ্যোতির্ময় সূর্যের এক সূক্ষ্ম কণা, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলতে জড় বস্তুর বিভক্ত হওয়ার মতো বোঝায় না। জীবাত্মা প্রথম থেকেই অণু-সদৃশ। এমন নয় যে, এই অণু-সদৃশ জীবাত্মা পূর্ণ পরমাত্মা থেকে খণ্ডিত হয়েছে। মায়াবাদ দর্শন বলে যে, পূর্ণ আত্মা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তার একটি অংশ, যাকে জীব বলা হয়, সে মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই দর্শন গ্রহণীয় নয়, কেননা আত্মাকে জড় পদার্থের মতো খণ্ডিত করা যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের অংশ জীব নিত্যকালই অংশ। যতক্ষণ পরম ঈশ্বর বিদ্যমান, ততক্ষণ তাঁর অংশও বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ সূর্যের অস্তিত্ব রয়েছে, ততক্ষণ তার অণু-সদৃশ রশ্মিও বর্তমান থাকবে।

বৈদিক শাস্ত্রে জীব-কণিকাকে কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তা অতি সূক্ষ্ম। পরম ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম, যদিও গুণগতভাবে পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। এই শ্লোকে দুইটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার একটি হচ্ছে *নিরন্তরম্*, অর্থাৎ 'অভিন্ন' অথবা 'সমগুণসম্পন্ন'। জীবকে এখানে *অণিমানম্*-ও বলা হয়েছে। *অণিমানম্* এর অর্থ 'অতি সূক্ষ্ম'। পরমাত্মা সর্ব ব্যাপ্ত, কিন্তু জীব হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম আত্মা। *অখণ্ডিতম্* শব্দটির অর্থ, জড় বিচারে যাকে ঠিক খণ্ডিত নয় বলা হয় তা নয়, পক্ষান্তরে 'স্বরূপগতভাবে সর্বদা অতি সূক্ষ্ম'। সূর্যের অণু-সদৃশ কিরণ-কণাকে কেউই সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, কিন্তু তা হলেও সূর্যের কিরণ-কণা সূর্যের মতো বিস্তৃত নয়। তেমনই, জীবাত্মা তাঁর স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, কিন্তু অণু-সদৃশ।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা ।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসম্ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তেন**—যুক্ত; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তি; **যুক্তেন**—যুক্ত; **চ**—এবং; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **পরিপশ্যতি**—দেখে; **উদাসীনম্**—অনাসক্ত; **প্রকৃতিম্**—জড় অস্তিত্ব; **চ**—এবং; **হত-ওজসম্**—ক্ষীণবল।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির সেই অবস্থায়, মানুষ ভক্তিযুক্ত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করেন; তখন তিনি জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হন, এবং তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব ক্ষীণবল হয়।

তাৎপর্য

কোন রোগের বীজাণু যেমন দুর্বল ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনই মায়া বা জড়া প্রকৃতির প্রভাব দুর্বল বদ্ধ জীবেদের উপর বিস্তার করতে পারে, কিন্তু মুক্ত জীবাত্মার উপর পারে না। আত্ম উপলব্ধি হচ্ছে মুক্ত অবস্থার স্তর। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞান

ব্যতীত উপলব্ধি সম্ভব নয়। জীব যে পরমেশ্বর ভগবানের অণু-সদৃশ বিভিন্ন অংশ, সেই উপলব্ধি তাঁকে জড় জগতের বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত করে। সেইটি ভগবদ্ভক্তির প্রারম্ভিক স্তর। জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হলে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না। তাই, এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন*—কেউ যখন তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হন এবং জড়-জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি *ভক্তিযুক্তেন* বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। *পরিপশ্যতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি সব কিছুই যথাযথভাবে দর্শন করেন। তখন তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব আর থাকে না বললেই চলে। সেই কথা ভগবদ্গীতায়ও প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—কেউ যখন তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং প্রসন্ন হন, এবং তখন তিনি সব রকম অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হন। ভগবান সেই অবস্থাটিকে *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্* বলে বর্ণনা করেছেন; সেই স্তরেই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। তেমনই, *নারদ-পঞ্চরাত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন সেইগুলি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে। যারা কলুষিত জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তারা কখনও ভক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৯

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি ।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

ন—না; **যুজ্যমানয়া**—সম্পাদিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অখিল-আত্মনি**—পরমাত্মা; **সদৃশঃ**—মতো; **অস্তি**—হয়; **শিবঃ**—শুভ; **পন্থাঃ**—পথ; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **ব্রহ্ম-সিদ্ধয়ে**—আত্ম উপলব্ধির সিদ্ধির জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত না হলে, কোন প্রকার যোগীই আত্ম উপলব্ধিতে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না, কেননা সেইটি হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা।

তাৎপর্য

ভক্তিযুক্ত না হলে, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পন্থা কখনই সার্থক হতে পারে না, সেই কথা এখানে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ন যুজ্যমানয়া* মানে হচ্ছে 'যুক্ত না হলে'। যখন ভক্তির অনুশীলন হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে, সেই ভক্তি কোথায় নিবেদন করতে হবে? ভক্তি নিবেদন করতে হবে পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা, এবং সেইটি হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি বা ব্রহ্ম উপলব্ধির একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা। *ব্রহ্মসিদ্ধয়ে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিজেকে জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন বলে উপলব্ধি করা, নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করা। বেদের ভাষায় তাকে বলা হয় *অহং ব্রহ্মাস্মি*। *ব্রহ্মসিদ্ধি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, সে জড় নয়, সে শুদ্ধ আত্মা, সেই কথা জানা। বিভিন্ন প্রকার যোগী রয়েছে, এবং সমস্ত যোগীরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি অথবা ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টায় যুক্ত থাকা। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত না হলে, ব্রহ্মসিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তখন দিব্য জ্ঞান এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। তাই ভক্তকে বৈরাগ্য অথবা জ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে চেষ্টা করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, কেবল সেবা মনোভাবের প্রভাবেই, সব কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *শিবঃ পন্থাঃ*—এটিই হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা। ব্রহ্ম উপলব্ধি লাভের জন্য ভক্তির মার্গ হচ্ছে সব চাইতে গোপনীয় সাধন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির সিদ্ধি ভগবদ্ভক্তির মঙ্গলময় পন্থার মাধ্যমেই লাভ করা যায়, তা ইঙ্গিত করে যে, তথাকথিত ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন ব্রহ্মসিদ্ধি নয়। ব্রহ্মজ্যোতির অতীত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। উপনিষদে ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন কৃপাপূর্বক ব্রহ্মজ্যোতির আবরণ উন্মোচন করেন, যাতে ভক্ত ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে ভগবানের নিত্য-শাশ্বত রূপ দর্শন করতে পারেন। মানুষ যতক্ষণ না ভগবানের দিব্য রূপ উপলব্ধি করতে পারে, ততক্ষণ ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না। ভক্তিতে ভক্তির গ্রাহক এবং ভক্তি অনুষ্ঠানকারী ভক্তের অস্তিত্ব অপরিহার্য। ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে ব্রহ্মসিদ্ধি। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটাকে হৃদয়ঙ্গম করা ব্রহ্মসিদ্ধি নয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করাও ব্রহ্মসিদ্ধি নয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অখিলাত্মা—তিনি পরমাত্মা। যিনি

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি তাঁর অন্যান্য রূপ, যথা—পরমাত্মা রূপ এবং ব্রহ্ম রূপ উপলব্ধি করেছেন, এবং সেটিই হচ্ছে ব্রহ্মসিদ্ধি-র সম্পূর্ণ উপলব্ধি।

শ্লোক ২০

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥

প্রসঙ্গম্—আসক্তি; **অজরম্**—প্রবল; **পাশম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তিগণ; **বিদুঃ**—জানে; **সঃ এব**—সেই; **সাধুষু**—ভক্তদের; **কৃতঃ**—প্রযুক্ত; **মোক্ষ-দ্বারম্**—মুক্তির দ্বার; **অপাবৃতম্**—উন্মুক্ত।

অনুবাদ

প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড় বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি যখন স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়ের প্রতি আসক্তিই যেমন সংসার জীবনের বন্ধনের কারণ, আবার সেই আসক্তি যখন অন্য কিছুতে প্রযুক্ত হয়, তখন মুক্তির দ্বার খুলে যায়। আসক্তিকে কখনও হত্যা করা যায় না; তা কেবল স্থানান্তরিত করতে হয়। জড় বস্তুর প্রতি আসক্তিকে বলা হয় জড় চেতনা, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তের প্রতি আসক্তিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনা। অতএব চেতনা হচ্ছে আসক্তির ভিত্তি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা যখন আমাদের চেতনাকে জড় চেতনা থেকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পবিত্র করি, তখন আমরা মুক্ত হই। যদিও বলা হয় যে, আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, তবুও জীবের পক্ষে বাসনা-রহিত হওয়া সম্ভব নয়। জীবের স্বরূপে, কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, কারোর যদি আসক্তির বস্তু না থাকে, কারও যদি সন্তান না থাকে, তা হলে সে তার সেই আসক্তিকে কুকুর এবং বিড়ালের প্রতি স্থানান্তরিত করে। তার থেকে বোঝা যায়

যে, আসক্ত হওয়ার প্রবণতা রোধ করা যায় না; তাই তাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তির ফলে, আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হই, কিন্তু সেই আসক্তি যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অথবা তাঁর ভক্তের প্রতি স্থানান্তরিত হয়, তখন তা মুক্তির কারণ হয়।

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, আসক্তিকে *স্বরূপ-সিদ্ধ* ভক্তের প্রতি বা *সাধুর* প্রতি প্রযুক্ত করা উচিত। *সাধু কে?* *সাধু* কোন গৈরিক বসন-পরিহিত অথবা দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত কোন সাধারণ মানুষ নন। *ভগবদ্গীতায়* সাধুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। কেউ যদি ভক্তির বিধি-বিধানগুলি কঠোরতা সহকারে অনুসরণ নাও করেন, অথচ তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তাঁকে সাধু বলে বুঝতে হবে। *সাধুরেব স মন্তব্যঃ* । সাধু হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির নিষ্ঠাবান অনুগামী। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি যথার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে চান, অথবা পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁর আসক্তি সাধু বা ভগবদ্ভক্তে স্থানান্তরিত করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। *লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়*—সাধুর ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবের ফলে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়।

মহাত্মা সাধুর প্রতিশব্দ। বলা হয়েছে যে, মহাত্মা বা ভগবানের উত্তম ভক্তের সেবা মুক্তির রাজপথ—*দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/২*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সেবা করলে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত ফল লাভ হয়। কেউ যদি কোন ঘোর জড়বাদী বা ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত ব্যক্তির সেবা করে, তা হলে সেই ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হবে। সেই একই তত্ত্ব এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের প্রতি আসক্তি হচ্ছে ভগবানের সেবার প্রতিই আসক্তি, কেননা কেউ যদি সাধুর সঙ্গ করে, তা হলে সাধু তাকে শিক্ষা দেবেন কিভাবে ভগবানের ভক্ত হতে হয়, ভগবানের পূজা করতে হয় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করতে হয়। এইগুলি হচ্ছে সাধুর উপহার। আমরা যদি কোন সাধুর সঙ্গ করতে চাই, তা হলে আমরা আশা করতে পারি না যে, তিনি আমাদের উপদেশ দেবেন, কিভাবে আমাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়। পক্ষান্তরে তিনি উপদেশ দেন, কিভাবে জড় আসক্তির কলুষিত গ্রন্থি ছেদন করে, ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা যায়। সেইটি সাধুসঙ্গের ফল। কপিল মুনি সর্ব প্রথমে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই প্রকার সঙ্গ থেকেই মুক্তির পন্থা শুরু হয়।

শ্লোক ২১

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥

তিতিক্ষবঃ—সহনশীল; **কারুণিকাঃ**—দয়ালু; **সুহৃদঃ**—বন্ধুত্বপূর্ণ; **সর্ব-দেহিনাম্**—সমস্ত জীবের; **অজাত-শত্রবঃ**—কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন নন; **শান্তাঃ**—শান্ত ; **সাধবঃ**—শাস্ত্রের অনুবর্তী; **সাধু-ভূষণাঃ**—সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত।

অনুবাদ

সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।

তাৎপর্য

উপরে যে সাধুর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত। তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে জীবের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা। সেটিই হচ্ছে তাঁর করুণা। তিনি জানেন যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য জীবন ব্যর্থ। ভগবদ্ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করেন, "কৃষ্ণভক্ত হও। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হও। পশু প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করে, তোমার জীবন নষ্ট করো না। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি, অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত।" সাধু এইভাবে প্রচার করেন। তিনি তাঁর নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদা অন্যের কথা চিন্তা করেন। তিনি সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের প্রতি সব চাইতে কৃপালু ব্যক্তি। তাই তাঁর একটি গুণ হচ্ছে কারুণিক—পতিত জীবেদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। প্রচার-কার্যে যুক্ত থাকার সময়, তাঁকে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই সাধু বা ভগবদ্ভক্তকে অত্যন্ত সহনশীল হতে হয়। কখনও কেউ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে, কেননা বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই ভগবানের বাণীর প্রচার তারা পছন্দ করে না; সেইটি হচ্ছে তাদের রোগ। সাধুদের অপ্রশংসিত দায়িত্ব হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির গুরুত্ব তাদের বোঝানো। কখনও কখনও ভক্তদের উপর নির্যাতন করা হয়। যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল, হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে চাবুক মারা হয়েছিল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই এবং

মাধাই প্রহার করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তা সহ্য করেছিলেন, কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পতিত জীবেদের উদ্ধার করা। সাধুর একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপালু। তিনি কৃপালু কেননা তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি কেবল মানব-সমাজেরই শুভাকাঙ্ক্ষী নন, তিনি পশু-সমাজেরও শুভাকাঙ্ক্ষী। এখানে বলা হয়েছে, *সর্বদেহিনাম্* অর্থাৎ জড় দেহ গ্রহণ করেছে যে সমস্ত জীব তাদের সকলের প্রতি। মানুষদেরই কেবল জড় দেহ লাভ হয়নি, কুকুর, বিড়াল আদি অন্য সমস্ত জীবেদেরও জড় দেহ রয়েছে। কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ ইত্যাদি সকলের প্রতিই ভগবদ্ভক্ত কৃপালু। তিনি সমস্ত জীবেদের প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন, যাতে তারা চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন শিষ্য শিবানন্দ সেন তাঁর দিব্য আচরণের মাধ্যমে একটি কুকুরকে পর্যন্ত মুক্তি দান করেছিলেন। সাধু-সঙ্গ করার ফলে কুকুরেরও মুক্ত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কেননা সাধু সমস্ত জীবের হিত সাধনের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ পরোপকারের কার্যে যুক্ত। সাধু যদিও কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না, তবুও এই পৃথিবী এতই অকৃতজ্ঞ যে, সাধুরও অনেক শত্রু হয়ে যায়।

শত্রু এবং মিত্রের পার্থক্য কি? সেইটি কেবল আচরণের পার্থক্য। সমস্ত জীবের প্রতি সাধুর যে আচরণ, তা বদ্ধ জীবেদের ভব-বন্ধন মোচনের জন্যই। তাই বদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য সাধুর থেকে বড় কোন বন্ধু হতে পারে না। সাধু শান্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে তিনি শাস্ত্রের নিয়ম পালন করেন। সাধু মানে যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং যিনি ভগবানের ভক্ত। যিনি প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হতে বাধ্য, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করতে সমস্ত শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সাধু মানে হচ্ছে, যিনি শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণকারী এবং যিনি ভগবানের ভক্ত। এই সমস্ত গুণাবলী ভগবদ্ভক্তের মধ্যে দেখা যায়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে সমস্ত দিব্য গুণাবলী বিকশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক বিচারে অভক্ত যতই যোগ্য হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক বিচারে তার কোন সদ্‌গুণ নেই।

শ্লোক ২২

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্ ।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **অনন্যেন-ভাবেন**—অবিচলিত চিত্তে; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **যে**—যাঁরা; **দৃঢ়াম্**—একনিষ্ঠ; **মৎ-কৃতে**—আমার জন্য; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **কর্মাণঃ**—কার্যকলাপ; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **স্ব-জন**—আত্মীয়-স্বজন **বান্ধবাঃ**—বন্ধু-বান্ধব।

অনুবাদ

এই প্রকার সাধুরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীকেও সাধু বলা হয়, কেননা তিনি তাঁর গৃহ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতি তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব—সব কিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী হচ্ছেন সাধারণত ত্যাগী, কিন্তু তাঁর সেই ত্যাগ তখনই সার্থক হয়, যখন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ঐকান্তিক সংযম সহকারে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তাই, এখানে বলা হয়েছে, *ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্।* যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনপূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি সাধু। সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি সমাজ, পরিবার, মানবতাবাদ ইত্যাদি সব কিছু দায়িত্ব কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য পরিত্যাগ করেছেন। এই জগতে জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই জীবের বহু দায়-দায়িত্ব এবং ঋণ থাকে—জনসাধারণের কাছে, দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, জীবসমূহের কাছে, পিতা-মাতার কাছে, পূর্বপুরুষদের কাছে এবং অন্যান্য অনেকের কাছে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য সেই সমস্ত দায়িত্বগুলি ত্যাগ করেন, তখন তাঁকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয় না। কিন্তু কেউ যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য এই সমস্ত দায়িত্বগুলি ত্যাগ করে, তা হলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্‌গতচেতসঃ ॥ ২৩ ॥

মৎ-আশ্রয়াঃ—আমার বিষয়ে; কথাঃ—কাহিনী; মৃষ্টাঃ—আনন্দদায়ক; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; কথয়ন্তি—কীর্তন করে; চ—এবং; তপন্তি—দুঃখ-দুর্দশা প্রদান করা; বিবিধাঃ—বিভিন্ন প্রকার; তাপাঃ—জড় ক্লেশ; ন—করে না; এতান্—তাঁদের; মৎ-গত—আমাতে নিবিষ্ট; চেতসঃ—চিত্ত।

অনুবাদ

নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সাধুরা কোন প্রকার জড়-জাগতিক তাপ অনুভব করেন না, কেননা তাঁরা সর্বদাই মদ্‌গত চিত্ত।

তাৎপর্য

এই সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—নানা প্রকার ক্লেশ রয়েছে। কিন্তু সাধুরা কখনও এই প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত হন না, কেননা তাঁদের চিত্ত সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কার্যকলাপের এবং লীলা-বিলাসের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান না। মহারাজ অম্বরীষ ভগবানের লীলা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বাক্যালাপ করতেন না। *বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে* (ভাগবত ৯/৪/১৮)। তিনি তাঁর বাক্ ইন্দ্রিয়কে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত রেখেছিলেন। সাধুরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের কথা শুনতে আগ্রহী। যেহেতু তাঁদের চিত্ত কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ, তাই তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন। সাধারণ বদ্ধ জীবেরা ভগবানের কার্যকলাপের কথা বিস্মৃত হয়েছে বলে, সর্বদাই জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত। কিন্তু অপর পক্ষে, ভক্তেরা যেহেতু ভগবানের কথায় মগ্ন থাকেন, তাই তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কথা বিস্মৃত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৪

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৪ ॥

তে এতে—যাঁরা; সাধবঃ—ভক্তেরা; সাধ্বি—হে সাধ্বী; সর্ব—সমস্ত; সঙ্গ—আসক্তি; বিবর্জিতাঃ—মুক্ত; সঙ্গঃ—আসক্তি; তেষু—তাঁদের; অথ—অতএব; তে—আপনার দ্বারা; প্রার্থ্যঃ—অন্বেষণীয়; সঙ্গ-দোষ—জড় আসক্তির দূষিত প্রভাব; হরাঃ—নিবৃত্তি সাধনকারী; হি—অবশ্যই; তে—তারা।

অনুবাদ

হে মাতঃ! হে সাধ্বি! এইগুলি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত মহান ভক্তদের গুণাবলী। আপনার অবশ্য কর্তব্য এই প্রকার সাধুদের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা তার ফলে জড় আসক্তি-জনিত সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

কপিল মুনি এখানে তাঁর মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যদি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে সাধু বা যে-সমস্ত ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আসক্তি বর্ধন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য তিনি, যিনি *নির্মানমোহাজিতসঙ্গদোষাঃ।* অর্থাৎ, যিনি জড় জগতের উপর আধিপত্য করার দাম্ভিক ভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ অত্যন্ত ধনী, যশস্বী বা সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সমস্ত দাম্ভিক ভাব থেকে মুক্ত হতে হবে, কেননা সেইটি তাঁর মিথ্যা উপাধি।

এখানে যে *মোহ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে নিজেকে ধনী অথবা দরিদ্র বলে মনে করা। এই জড় জগতে যে নিজেকে অত্যন্ত ধনী অথবা দরিদ্র বলে মনে করে, অথবা জড় অস্তিত্বের সম্পর্কে এই প্রকার যে কোন ধারণা—তা মিথ্যা, কেননা এই শরীরটি অসৎ বা অনিত্য। যে শুদ্ধ আত্মা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তাঁকে সর্ব প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে আমাদের চেতনা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ প্রভাবে কলুষিত; তাই *ভগবদ্গীতায়* এই একই তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *জিতসঙ্গদোষাঃ*—প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এইখানেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—যে-শুদ্ধ ভক্ত চিৎ-জগতে ফিরে যেতে চান, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ থেকে মুক্ত। আমাদের সেই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। ব্যবসায়ীদের, বৈজ্ঞানিকদের এবং মানব-সমাজের বিশেষ শিক্ষা এবং চেতনা বিকশিত করার বহু সংঘ রয়েছে, কিন্তু এমন কোন সংঘ নেই যা সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। কেউ যদি সেই স্তর

প্রাপ্ত হয়, যেখানে সে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাঁকে ভক্তের সংঘ খুঁজতে হবে, যেখানে একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন হয়। তার ফলে মানুষ সমস্ত জড় সংঘ থেকে মুক্ত হতে পারে।

ভক্ত যেহেতু সমস্ত কলুষিত জড় সংঘ থেকে মুক্ত, তাই তিনি জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও মনে হয় যে, তিনি জড় জগতে রয়েছেন, কিন্তু তিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তা কি করে সম্ভব? তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, বিড়ালের কার্যকলাপের মাধ্যমে। বিড়াল তার মুখে করে তার শাবককে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়, আর সে যখন একটি ইঁদুরকে মারে, তখন তাকেও তার মুখে করে নিয়ে যায়। এইভাবে উভয়কেই বিড়াল মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের অবস্থা ভিন্ন। বিড়াল-শাবকটি তার মায়ের মুখে সুখ অনুভব করে, কিন্তু ইঁদুর বিড়ালের মুখে মৃত্যুর আঘাত অনুভব করে। তেমনই, যাঁরা সাধবঃ বা কৃষ্ণভাবনাময় অপ্রাকৃত সেবাপরায়ণ ভক্ত, তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কলুষ অনুভব করেন না, কিন্তু যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা সেই সংসার-দুঃখ অনুভব করে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তসঙ্গের অন্বেষণ করা, এবং এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন। তাঁদের বাণী এবং উপদেশের দ্বারা তিনি সংসার-বন্ধন ছেদন করতে সক্ষম হবেন।

শ্লোক ২৫

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সতাম্—শুদ্ধ ভক্তদের; **প্রসঙ্গাৎ**—সঙ্গ প্রভাবে; **মম**—আমার; **বীর্য**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **সংবিদঃ**—আলোচনার ফলে; **ভবন্তি**—হয়; **হৃৎ**—হৃদয়ের; **কর্ণ**—কানের; **রস-অয়নাঃ**—আনন্দদায়ক; **কথাঃ**—কাহিনী; **তৎ**—তার; **জোষণাৎ**—অনুশীলনের দ্বারা; **আশু**—শীঘ্রই; **অপবর্গ**—মুক্তির; **বর্ত্মনি**—মার্গে; **শ্রদ্ধা**—দৃঢ় বিশ্বাস; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অনুক্রমিষ্যতি**—ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ভাবে মুক্ত হওয়ার পর, যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত এবং ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করতে হয়। এই প্রকার সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা অথবা অধ্যয়নের দ্বারা যথাযথভাবে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত, কেননা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মানুষ সাধারণত পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপকে স্বীকার করে। যেহেতু তারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন এক সবিশেষ পুরুষ এবং তাঁর কার্যকলাপ রয়েছে। এইটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, ততক্ষণ ভক্তির কোন অর্থই হয় না। সেবা বা ভক্তি নিরাকার বা নির্বিশেষ কোন কিছুতেই করা যায় না। সেবা কোন ব্যক্তিকে করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য যে-সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে, অভক্তেরা সেইগুলি পাঠ করে কৃষ্ণভক্তির মূল্য নিরূপণ করতে পারে না; তারা মনে করে যে, এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা কতকগুলি মনগড়া গল্প-কথা। ভগবদ্ভক্তির মহিমা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেননা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তাদের কাছে বিশ্লেষণ করা হয়নি। পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, তাঁকে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করতে হয়, এবং এই সঙ্গ প্রভাবে, যখন ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের সম্বন্ধে মনন করা হয় ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়, তখন তাঁর কাছে মুক্তির দ্বার খুলে যায়, এবং তিনি মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যার সুদৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে, তিনি নিষ্ঠাপরায়ণ হন, এবং ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গ করার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা মানে ভগবানের সঙ্গ করা। যে ভক্ত এইভাবে

সঙ্গ করেন, তাঁর ভগবানের সেবা করার বাসনা বর্ধিত হয়, এবং তার পর ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৬

ভক্ত্যা পুমাঞ্জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া ।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **পুমান্**—মানুষ; **জাত-বিরাগঃ**—বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ার ফলে; **ঐন্দ্রিয়াৎ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **দৃষ্ট**—দেখে (এই জগতে); **শ্রুতাৎ**—শ্রবণ করে (পরবর্তী জগতে); **মৎ-রচন**—সৃষ্টি আদি বিষয়ে আমার কার্যকলাপ; **অনুচিন্তয়া**—নিরন্তর চিন্তা করার ফলে; **চিত্তস্য**—মনের; **যত্তঃ**—যুক্ত; **গ্রহণে**—নিয়ন্ত্রণে; **যোগ-যুক্তঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত; **যতিষ্যতে**—প্রয়াস করবে; **ঋজুভিঃ**—সহজ; **যোগ-মার্গৈঃ**—যৌগিক পন্থার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে, নিরন্তর ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে, ইহলোকে এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হচ্ছে সব চাইতে সহজ-সরল যোগ অনুশীলনের পন্থা; কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যথাযথভাবে যুক্ত হন, তিনি তখন তাঁর মনকে সংযত করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

সমস্ত শাস্ত্রে পুণ্য কর্ম করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাতে তারা কেবল এই জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু ভক্তসঙ্গে ভগবানের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করতে অধিক আকৃষ্ট—কিভাবে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে তা তিনি

পালন করছেন, কিভাবে এই সৃষ্টি লয় হয়, এবং কিভাবে ভগবানের চিন্ময় ধামে ভগবানের লীলাসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণিত পূর্ণ সাহিত্য রয়েছে, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসংহিতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত*। ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করেন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার এবং সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান, এবং তার ফলে তিনি এই পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা অন্যান্য কোন গ্রহলোকে তথাকথিত সুখভোগ করার প্রতি বিরক্তি অনুভব করেন। ভগবদ্ভক্তেরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের সঙ্গ করতেই আগ্রহী; অনিত্য জড় সুখের প্রতি তাঁদের আর কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। সেটিই হচ্ছে *যোগযুক্ত* ব্যক্তির স্থিতি। *যোগযুক্ত* ব্যক্তি এই পৃথিবীর অথবা অন্যান্য লোকের আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত হন না; তিনি কেবল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পারমার্থিক স্থিতি সম্বন্ধে আগ্রহী। এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করার সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। *ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ*। এখানে যে *ঋজুভিঃ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত, তার অর্থ হচ্ছে 'অত্যন্ত সহজ'। যোগ-সিদ্ধি লাভের জন্য অনেক *যোগ-মার্গ* রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পন্থাটি হচ্ছে সব চাইতে সহজ। এইটি কেবল সব চাইতে সহজ পন্থাই নয়, তার ফলটিও হচ্ছে সর্বোত্তম। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণ করতে চেষ্টা করা এবং জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা।

শ্লোক ২৭

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন ।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ২৭ ॥

অসেবয়া—সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **প্রকৃতেঃ গুণানাম্**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতেন**—বিকশিত; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিতয়া**—অবিচলিত; **চ**—এবং; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরমতত্ত্ব; **ইহ**—এই জীবনে; **অবরুন্ধে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

এইভাবে প্রকৃতির গুণের সেবায় যুক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করে, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ করে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা সে এই জীবনেই আমার সঙ্গ লাভ করে, কেননা আমি হচ্ছি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

কেউ যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন আদি প্রামাণিক শাস্ত্র-বিহিত নবধা ভক্তির একটি, দুইটি অথবা সব কয়টি অঙ্গের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর স্বাভাবিকভাবেই আর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ করার কোন সুযোগ থাকে না। ভগবদ্ভক্তিতে ভালভাবে যুক্ত না হলে, জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা ভক্ত নয়, তারা হাসপাতাল অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে তথাকথিত জনহিতকর কার্যকলাপে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। সেইগুলি নিঃসন্দেহে শুভ কর্ম—এই অর্থে যে, সেইগুলি হচ্ছে পুণ্য কর্ম, এবং তার ফলে অনুষ্ঠানকারী এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয় সুখভোগের কিছু সুযোগ পাবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখের সীমার বাইরে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় কার্যকলাপ। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ পান না। কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপ অন্ধের মতো অনুষ্ঠিত হয় না, পক্ষান্তরে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-ভিত্তিক আদর্শ জ্ঞানের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি সহকারে মনকে সর্বদাই যুক্ত করার এই যোগের পন্থা মুক্তি প্রদানকারী, এবং তা এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি এই ধরনের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তের কাছে ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার পন্থা অনুমোদন করেছেন। শ্রোতা যে স্তরেরই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি বিনম্র এবং বিনীতভাবে তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির কাছে ভগবানের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অন্য সমস্ত পন্থার দ্বারা অজিত যে ভগবান তাঁকে জয় করতে পারেন। আত্ম উপলব্ধির জন্য শ্রবণ অথবা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

শ্লোক ২৮

দেবহূতিরুবাচ

কাচিত্ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা ।
যয়া পদং তে নির্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **কাচিৎ**—কি; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **উচিতা**—উচিত; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **কীদৃশী**—কি প্রকার; **মম**—আমার দ্বারা; **গো-চরা**—অনুষ্ঠানের উপযুক্ত; **যয়া**—যার দ্বারা; **পদম্**—পা; **তে**—আপনার; **নির্বাণম্**—মুক্তি; **অঞ্জসা**—শীঘ্রই; **অন্বাশ্নবৈ**—প্রাপ্ত হব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ভগবানের এই বাণী শুনে, দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি প্রকার ভক্তি বিকাশ করব এবং অভ্যাস করব, যার ফলে আমি অনায়াসে এবং শীঘ্রই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হতে পারি?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের সেবা করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁরাও সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করে, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। বিভিন্ন প্রকার ভক্তের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত ভক্তিমূলক সেবা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৯

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥ ২৯ ॥

যঃ—যা; **যোগঃ**—যোগের পন্থা; **ভগবৎ-বাণঃ**—পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে; **নির্বাণ-আত্মন্**—হে নির্বাণ-স্বরূপ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদিতঃ**—উক্ত; **কীদৃশঃ**—কি প্রকার; **কতি**—কত; **চ**—এবং; **অঙ্গানি**—শাখা-প্রশাখা; **যতঃ**—যার দ্বারা; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **অববোধনম্**—জানা যায়।

অনুবাদ

আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, যোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি সাধন করা। দয়া করে আপনি বলুন সেই যোগ কি প্রকার, এবং কতভাবে সেই অলৌকিক যোগকে বোঝা যায়?

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতি রয়েছে। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, এবং হঠযোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি, কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন আদি নয়টি অঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় যে-ভক্তিযোগ, তার লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। আত্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কিন্তু এখানে দেবহূতি বিশেষভাবে ভক্তিযোগের উল্লেখ করেছেন, যা ইতিমধ্যে ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তিযোগের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, সেবন, আজ্ঞা পালন (দাস্য), তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা (সখ্য) এবং চরমে সব কিছু ভগবানের সেবায় অর্পণ করা (আত্ম-নিবেদন)। এই শ্লোকে *নির্বাণাত্মন্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উৎসাহী, কিন্তু তারা যদি কঠোর তপস্যা করার পরে ব্রহ্মজ্যোতির স্তরে উন্নীতও হন, তা হলেও তাদের এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, জ্ঞান যোগের প্রভাবে প্রকৃত পক্ষে জড় অস্তিত্বের নিবৃত্তি হয় না। তেমনই, হঠযোগের পন্থাতেও, যার লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মাকে জানা, দেখা গেছে যে, বিশ্বামিত্রের মতো বহু যোগীরা অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার পর, ভক্তিযোগী কখনও আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*—একবার সেখানে গেলে, আর তাকে ফিরে আসতে হয় না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—এই দেহ ত্যাগ করার পর, তাকে আর পুনরায় জড় শরীর ধারণ করার জন্য এখানে ফিরে আসতে হয় না। *নির্বাণ*-এর ফলে আত্মার অস্তিত্বের সমাপ্তি হয় না। আত্মা নিত্য। তাই *নির্বাণের* অর্থ হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি, এবং জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি মানে হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞাসা করে, জীব কিভাবে চিৎ-জগৎ থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়। এখানে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোকে

সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে না আসা পর্যন্ত, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তর থেকে অথবা যোগ-সমাধির স্তর থেকে, জীবের অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। এই শ্লোকে আর একটি শব্দ ভগবদ্বাণঃ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাণঃ মানে হচ্ছে 'তীর'। ভক্তিযোগের পন্থা ঠিক পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ার মতো। ভক্তিযোগ কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মা উপলব্ধির উদ্দেশ্য সাধন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে না। এই বাণঃ এত তীক্ষ্ণ এবং বেগবান যে, তা নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা অনুভূতির স্তর ভেদ করে, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যায়।

শ্লোক ৩০

তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে ।
সুখং বুদ্ধ্যেয় দুর্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

তৎ এতৎ—সেই; মে—আমাকে; বিজানীহি—কৃপা করে ব্যাখ্যা করুন; যথা—যাতে; অহম্—আমি; মন্দ—স্থূল; ধীঃ—বুদ্ধি; হরে—হে ভগবান; সুখম্—সহজ; বুদ্ধ্যেয়—হৃদয়ঙ্গম করতে পারি; দুর্বোধম্—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; যোষা—স্ত্রী; ভবৎ-অনুগ্রহাৎ—আপনার কৃপায়।

অনুবাদ

হে আমার প্রিয় পুত্র কপিল! আমি একজন স্ত্রীলোক। আমার পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন কেননা আমার বুদ্ধি অল্প। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে বিশ্লেষণ করেন, তা হলে মন্দবুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমি তা বুঝতে পারব এবং তার ফলে দিব্য সুখ অনুভব করতে পারব।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বজ্ঞান অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; কিন্তু গুরুদেব যদি শিষ্যের প্রতি সদয় হন, তা হলে সেই শিষ্য যতই নির্বোধ হোক না কেন, গুরুদেবের দিব্য কৃপায় তার কাছে সব কিছু প্রকাশিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্*, গুরুদেবের কৃপায়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা, *ভগবৎ-প্রসাদঃ* প্রকাশিত হয়। দেবহূতি তাঁর মহান পুত্রকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হন, কেননা তিনি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন

স্ত্রীলোকে এবং তাঁর মাতা। কপিলদেবের কৃপায় তাঁর পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছিল, যদিও সেই বিষয়টি সাধারণ মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

শ্লোক ৩১

মৈত্রেয় উবাচ

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং
জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎপ্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **বিদিত্বা**—জেনে; **অর্থম্**—অভিপ্রায়; **কপিলঃ**—ভগবান কপিল; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **ইত্থম্**—এইভাবে; **জাত-স্নেহঃ**—কৃপাপরবশ হয়েছিলেন; **যত্র**—যাঁর প্রতি; **তন্বা**—তাঁর দেহ থেকে; **অভিজাতঃ**—জাত; **তত্ত্ব-আম্নায়ম্**—গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **প্রবদন্তি**—বলা হয়; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য দর্শন; **প্রোবাচ**—বর্ণনা করেছিলেন; **বৈ**—বাস্তবিকভাবে; **ভক্তি**—ভক্তি; **বিতান**—বিস্তার করে; **যোগম্**—যোগ।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—তাঁর মায়ের কথা শুনে, কপিলদেব তাঁর উদ্দেশ্য অবগত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তিনি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন কেননা তাঁর দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে সাংখ্য দর্শন বর্ণনা করেছিলেন, যা গুরু-পরম্পরায় ভক্তি এবং যোগের সমন্বয়।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্ ।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **দেবানাম্**—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের; **গুণ-লিঙ্গানাম্**—যা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়; **আনুশ্রবিক**—শাস্ত্র অনুসারে; **কর্মণাম্**—কোন কর্ম; **সত্ত্বে**—মনে অথবা ভগবানে; **এব**—কেবল; **এক-মনসঃ**—অবিকৃত মন-সমন্বিত ব্যক্তির; **বৃত্তিঃ**—প্রবণতা; **স্বাভাবিকী**—স্বাভাবিক; **তু**—প্রকৃত পক্ষে; **যা**—যা; **অনিমিত্তা**—নিমিত্ত-রহিত; **ভাগবতী**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **সিদ্ধেঃ**—মুক্তির থেকেও; **গরীয়সী**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

কপিলদেব বললেন—ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের প্রতীক, এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন দেবতাদের প্রতীক, তেমনই মন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। সেই সেবার ভাব যখন কোন রকম উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তা মুক্তির থেকেও অনেক অধিক শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বেদ-বিহিত কার্যে অথবা বৈষয়িক কার্যে সর্বদা যুক্ত। ইন্দ্রিয়-সমূহের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্যে কার্য করা, এবং মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে মন ইন্দ্রিয়সমূহের নেতা; তাই তাকে বলা হয় সত্ত্ব। তেমনই এই জড় জগতের বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের নায়ক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন দেবতাদের প্রতীক, এবং মন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। সেবা যখন পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে সম্পাদিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের একটি নাম হচ্ছে 'হৃষীকেশ', কেননা তিনি প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু বা অধীশ্বর। ইন্দ্রিয় এবং মনের স্বাভাবিকভাবেই কর্ম করার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি যখন জড়ের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখন তা কোন জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে অথবা দেবতাদের সেবার উদ্দেশ্যে কার্য করে, যদিও প্রকৃত পক্ষে সেইগুলির উদ্দেশ্য ভগবানের সেবা করা। ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় হৃষীক, এবং পরমেশ্বর

ভগবানের একটি নাম হচ্ছে হৃষীকেশ। পরোক্ষভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক প্রবণতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রয়েছে। তাকে বলা হয় ভক্তি।

কপিলদেব বলেছেন, ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড়-জাগতিক লাভ অথবা অন্যান্য স্বার্থপর উদ্দেশ্য-রহিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় ভক্তি। এই সেবার ভাব মুক্তির থেকেও বা সিদ্ধির থেকেও অনেক গুণ শ্রেয়। ভক্তি বা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার প্রবণতা হচ্ছে এমনই একটি পারমার্থিক স্তর, যা মুক্তির থেকেও অনেক ভাল। তাই মুক্তির স্তর অতিক্রম করার পর হচ্ছে ভক্তির স্তর। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, অথবা বেদ-বিহিত কর্মে যুক্ত হয়, তখন কোন হেতু বা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তাকে বলা হয় *অনিমিত্তা* এবং সেইটি হচ্ছে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, মন যখন বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত না হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়, তা বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি থেকেও অনেক গুণে শ্রেয়।

শ্লোক ৩৩

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

জরয়তি—গলিয়ে ফেলে; **আশু**—শীঘ্রই; **যা**—যা; **কোশম্**—সূক্ষ্ম শরীরকে; **নিগীর্ণম্**—ভুক্ত দ্রব্য; **অনলঃ**—অগ্নি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভক্তি জীবের সূক্ষ্ম দেহকে অতিরিক্ত প্রয়াস ব্যতীতই ক্ষয় করে ফেলে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে দেয়।

তাৎপর্য

ভক্তির স্তর মুক্তির অনেক ঊর্ধ্বে কেননা মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, জঠরাগ্নি আমাদের সমস্ত আহারকে হজম করতে পারে। পচন-শক্তি যথেষ্ট হলে, আমরা যা কিছুই

খাই না কেন, তা জঠরাগ্নির দ্বারা হজম হয়ে যাবে। তেমনই, ভক্তকে আলাদাভাবে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেই সেবা হচ্ছে মুক্তির পন্থা, কেননা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া মানে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথাটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী দাসীর মতো আমার সেবা করেন। দাসীর মতো মুক্তিদেবী আমি যা চাই তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।"

ভক্তের কাছে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়। কোন রকম পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই মুক্তি লাভ হয়ে যায়। তাই মুক্তি বা নির্বিশেষ স্তর থেকে ভক্তি অনেক শ্রেয়। নির্বিশেষবাদীরা মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধন করেন, কিন্তু ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, বিশেষ করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, এবং ভগবানের প্রসাদ সেবা করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর জিহ্বাকে সংযত করতে সক্ষম হন। জিহ্বা সংযত হলে, স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের সংযম হচ্ছে যোগের পূর্ণতা এবং কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই তাঁর মুক্তি শুরু হয়। কপিলদেব প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্তিযোগ সিদ্ধি বা মুক্তি থেকে গরীয়সী।

শ্লোক ৩৪

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনই না; **এক-আত্মতাম্**—একত্বে লীন হয়ে যাওয়া; **মে**—আমার; **স্পৃহয়ন্তি**—আকাঙ্ক্ষা করে; **কেচিৎ**—কোন; **মৎ-পাদ-সেবা**—আমার চরণ-কমলের সেবা; **অভিরতাঃ**—যুক্ত; **মৎ-ঈহাঃ**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা করে; **যে**—যারা; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পর; **ভাগবতাঃ**—শুদ্ধ ভক্ত; **প্রসজ্য**—মিলিত হয়ে; **সভাজয়ন্তে**—গুণগান করে; **মম**—আমার; **পৌরুষাণি**—মহিমান্বিত কার্যকলাপের।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই আমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তিনি কখনও আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই আমার লীলা-বিলাসের এবং কার্যকলাপের কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, অথবা নিজের ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করে পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়া। একে বলা হয় *একাত্মতাম্* । ভক্ত কখনও এই প্রকার মুক্তি স্বীকার করে না। অন্য চারটি মুক্তি হচ্ছে—ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া বা *সালোক্য* মুক্তি, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করা বা *সামীপ্য* মুক্তি, ভগবানের মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া বা *সার্ষ্টি* মুক্তি, এবং ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া বা *সারূপ্য* মুক্তি। শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই পাঁচ প্রকার মুক্তির কোনটি আকাঙ্ক্ষা করেন না, যা কপিল মুনি বিশ্লেষণ করবেন। তিনি বিশেষভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিকে নারকীয় বলে মনে করে ঘৃণা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *কৈবল্যং নরকায়তে* —"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে-সুখ, যা মায়াবাদীরা কামনা করে, তা নারকীয় বলে মনে করা হয়। এই একাত্মতা শুদ্ধ ভক্তদের জন্য নয়।

তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে যারা মনে করে যে, বদ্ধ অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা হলেও, চরমে ভগবান বলে কোন ব্যক্তি নেই; তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব যেহেতু নির্বিশেষ, তাই সাময়িকভাবে তার একটা রূপ কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি লাভের পর সেই আরাধনা বন্ধ হয়ে যায়। এটি হচ্ছে মায়াবাদীদের দর্শন। প্রকৃত পক্ষে নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে তারা তাঁর দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। যদিও এই ব্রহ্মজ্যোতি ভগবানের সবিশেষ দেহ থেকে অভিন্ন, তথাপি এই প্রকার একাত্মতা (পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া) শুদ্ধ ভক্ত কখনও গ্রহণ করতে চান না, কেননা শুদ্ধ ভক্তদের আনন্দ ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার তথাকথিত ব্রহ্মানন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি। সর্ব শ্রেষ্ঠ আনন্দ হচ্ছে ভগবানের সেবা করার আনন্দ। ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে ভগবানের সেবা করা যায়; তাঁরা জড় জগতের সব চাইতে বড় বাধা-বিপত্তির মধ্যে থেকেও সর্বদাই ভগবানের সেবা করার উপায় চিন্তা করেন।

মায়াবাদীরা ভগবানের লীলার বর্ণনাকে গল্প বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেইগুলি গল্প নয়; সেইগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের

লীলা-বিলাসের বর্ণনাকে গল্পকথা বলে মনে না করে, পরম সত্যরূপে গ্রহণ করেন। এখানে *মম পৌরুষাণি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তেরা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করার প্রতি সর্বদাই অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু মায়াবাদীরা এই সমস্ত কার্যকলাপের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। তাদের মতে পরমতত্ত্ব নির্বিশেষ। সবিশেষ অস্তিত্ব না থাকলে, কার্যকলাপ কিভাবে সম্ভব? নির্বিশেষবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের যে কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেইগুলিকে কল্পনা-প্রসূত গল্পকথা বলে মনে করে, এবং তাই তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে তার কদর্থ করে তা বিশ্লেষণ করে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কেবল অজ্ঞ জনসাধারণকে বিপথগামী করার জন্য অনর্থক শাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করে, তার কদর্থ করে তা ব্যাখ্যা করে। মায়াবাদীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের ভাষ্য শুনতে নিষেধ করেছেন। কেননা তার ফলে সর্বনাশ হবে, এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির মার্গে কখনও আর প্রবেশ করতে পারবে না, অথবা দীর্ঘ কালের পর ভক্তিমার্গে আসতে পারবে।

কপিল মুনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি মুক্তিরও অতীত। তাকে বলা হয় *পঞ্চম পুরুষার্থ*। সাধারণত মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কাজে ব্যস্ত, এবং চরমে তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ভক্তি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব রকম কপট ধর্ম *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সব রকম আচার অনুষ্ঠান, এবং তার পর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে নিরাশ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, এই সব কিছুই *শ্রীমদ্ভাগবতে* সর্বতোভাবে বর্জন করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* বিশেষ করে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের জন্য, যাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের মহিমা-কীর্তনে যুক্ত। বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরায় ভগবানের যে-সমস্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য *পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে, শুদ্ধ ভক্তেরা তার আরাধনা করেন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা সেইগুলিকে গল্পকথা বলে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেইগুলি অত্যন্ত মহান এবং আরাধ্য বিষয়, এবং তাই ভগবদ্ভক্তেরাই কেবল তা আস্বাদন করতে পারেন। সেইটিই হচ্ছে মায়াবাদী এবং শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি ।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

পশ্যন্তি—দেখেন; **তে**—তারা; **মে**—আমার; **রুচিরাণি**—সুন্দর; **অম্ব**—হে মাতঃ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **প্রসন্ন**—হাস্যোজ্জ্বল; **বক্ত্র**—মুখ; **অরুণ**—প্রভাতকালীন সূর্যের মতো; **লোচনানি**—নেত্র; **রূপাণি**—রূপ; **দিব্যানি**—দিব্য; **বর-প্রদানি**—সর্ব মঙ্গলময়; **সাকম্**—আমার সঙ্গে; **বাচম্**—বাণী; **স্পৃহণীয়াম্**—অনুকূল; **বদন্তি**—তারা বলে।

অনুবাদ

হে মাতঃ। আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ লোচনযুক্ত আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল-সমন্বিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্ব মঙ্গলময় বিভিন্ন রূপ দর্শন করতে চান, এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান।

তাৎপর্য

মায়াবাদী এবং নাস্তিকেরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রতিমা বলে মনে করে, কিন্তু ভক্তেরা প্রতিমা-পূজক নন। তাঁরা ভগবানের *অর্চা* অবতাররূপে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পূজা করেন। *অর্চা* মানে হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থায় যে-রূপে আমরা তাঁর আরাধনা করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের জড় চক্ষু এবং জড় ইন্দ্রিয় তাঁর চিন্ময় রূপ অনুভব করতে পারে না। আমাদের পক্ষে জীবাত্মার চিন্ময় রূপ পর্যন্ত দর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন আমরা দেখতে পাই না, কিভাবে চিন্ময় আত্মা দেহ ত্যাগ করে। এইটি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দোষ। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়ার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যে-রূপ গ্রহণ করেন, তাকে বলা হয় *অর্চা-বিগ্রহ*। এই *অর্চা-বিগ্রহকে* কখনও কখনও *অর্চা* অবতারও বলা হয়, এবং তা তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যেমন অনেক অবতার গ্রহণ করেন, তেমনই তিনি মাটি, কাঠ, ধাতু, মণি ইত্যাদি পদার্থ থেকে তৈরি রূপ গ্রহণ করেন।

ভগবানের রূপ ব্যক্ত করার বহু শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত রূপগুলি জড় নয়। ভগবান যদি সর্ব ব্যাপক হন, তা হলে তিনি জড় পদার্থেও রয়েছেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নাস্তিকদের ধারণা ঠিক তার বিপরীত। যদিও তারা প্রচার করে সব কিছুই ভগবান, কিন্তু যখন তারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, তখন তারা তাকে ভগবান বলে স্বীকার করে না। তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব কিছুই ভগবান, তা হলে বিগ্রহ ভগবান হবেন না কেন? প্রকৃত পক্ষে, ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন রকম; তাঁদের দৃষ্টি ভগবৎ প্রেমরূপী অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত। ভগবানের বিভিন্ন রূপ দর্শন করা মাত্রই ভক্তেরা প্রেমাপ্লুত হয়ে ওঠেন, কেননা তাঁরা নাস্তিকদের মতো মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহকে তাঁর থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। ভক্তেরা মন্দিরে ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহকে অপ্রাকৃত এবং চিন্ময় বলে মনে করেন, এবং তাঁদের কাছে তাঁর সাজ-সজ্জা এবং অলঙ্করণ অত্যন্ত প্রিয়। গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার কিভাবে করতে হয়, কিভাবে মন্দির মার্জন করতে হয়, এবং কিভাবে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। বিষ্ণু মন্দিরে অনেক বিধি-বিধান পালন করা হয়, এবং ভক্তেরা সেখানে গিয়ে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন, কেননা ভগবানের সমস্ত বিগ্রহ অত্যন্ত বদান্য। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভক্তেরা তাঁদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, এবং অনেক সময় শ্রীবিগ্রহ উত্তর দেন। তবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অতি উন্নত স্তরের ভক্তেরাই কথা বলতে পারেন। কখনও কখনও ভগবান স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর ভক্তদের নির্দেশ দেন। শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে ভক্তদের এই ভাবের বিনিময় নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষে তা উপভোগ করেন। কপিল মুনি বিশ্লেষণ করছেন, ভক্তেরা কিভাবে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সুন্দর শৃঙ্গার এবং মুখমণ্ডল দর্শন করেন, এবং কিভাবে তাঁরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

শ্লোক ৩৬

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমন্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৬ ॥

তৈঃ—সেই রূপের দ্বারা; দর্শনীয়—মনোহর; অবয়বৈঃ—অবয়ব; উদার—উদার; বিলাস—লীলা-বিলাস; হাস—হাসি; ঈক্ষিত—অবলোকন; বাম—মনোহর; সূক্তৈঃ—আনন্দদায়ক বাণী; হৃত—মোহিত; আত্মনঃ—মন; হৃত—মোহিত; প্রাণান্—ইন্দ্রিয়সমূহ; চ—এবং; ভক্তি—ভক্তি; অনিচ্ছতঃ—অনিচ্ছা; মে—আমার; গতিম্—ধাম; অণ্বীম্—সূক্ষ্ম; প্রযুঙ্ক্তে—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তার ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান।

তাৎপর্য

তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্তেরাও মুক্ত আত্মা। এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যদিও তাঁদের কোন জ্ঞান নেই, কেবল মাত্র মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মনোহর শৃঙ্গার দর্শন করে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, ভক্তেরা তাঁদের অন্য সমস্ত চেতনা হারান। কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার ফলে, অজ্ঞাতভাবেই তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে। কেবল মাত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনন্য ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত ব্রহ্মের সমান হয়ে যান। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।* অর্থাৎ জীব তার স্বরূপে ব্রহ্ম কেননা তিনি পরম ব্রহ্মের অভিন্ন অংশ। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হওয়ার ফলে, তিনি মোহাচ্ছন্ন এবং মায়াগ্রস্ত হন। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি হচ্ছে মায়া। অন্যথায় তিনি শাশ্বতরূপে ব্রহ্ম।

কেউ যখন আপন স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। 'ব্রহ্ম' বলতে বোঝায় আত্ম উপলব্ধির অবস্থা। কনিষ্ঠ ভক্ত, যিনি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে খুব একটা উন্নত নন, কিন্তু গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন, ভগবানের কথা চিন্তা করেন, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং

ভগবানকে নিবেদন করার জন্য ফল-ফুল নিয়ে আসেন—তিনিও অজ্ঞাতসারে মুক্তি লাভ করেন। *শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ* —গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্ত শ্রীবিগ্রহকে সম্মান করেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন করেন। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, এবং সীতা-রাম-এর বিগ্রহ ভক্তদের কাছে এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁরা যখন মন্দিরে সুন্দরভাবে সজ্জিত সেই বিগ্রহ দর্শন করেন, তখন তাঁরা ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে যান। সেইটি মুক্তির অবস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায়, এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কনিষ্ঠ ভক্তেরাও দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং যাঁরা জ্ঞান অথবা অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা মুক্তি লাভের চেষ্টা করছেন, তাঁদের থেকে তাঁরা অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। শুকদেব গোস্বামী এবং চার কুমারের মতো মহান নির্বিশেষবাদীরাও মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য, তাঁর শৃঙ্গার এবং তাঁর চরণে নিবেদিত তুলসীর সুগন্ধের দ্বারা মোহিত হয়ে ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা মুক্ত অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদী থাকার পরিবর্তে তাঁরা ভগবানের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

এখানে *বিলাস* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *বিলাস* বলতে ভগবানের কার্যকলাপ বা লীলা বোঝায়। মন্দিরে ভগবানের আরাধনার একটি অঙ্গ হচ্ছে সুন্দর শৃঙ্গারে সজ্জিত তাঁর রূপই কেবল দর্শন করা নয়, সেই সঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* অথবা এই ধরনের শাস্ত্র যা নিয়মিতভাবে মন্দিরে পাঠ হয়, তা শ্রবণ করা। বৃন্দাবনে একটি প্রথা রয়েছে যে, প্রত্যেক মন্দিরে *শাস্ত্র* পাঠ হয়। এমন কি কনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান নেই অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* বা *ভগবদ্গীতা* পাঠ করার সময় নেই, তিনিও এইভাবে ভগবানের লীলা-বিলাস শ্রবণ করার সুযোগ পান। এইভাবে তাঁদের মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তায়—তাঁর রূপ, তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর অপ্রাকৃত প্রকৃতির চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে। কৃষ্ণভাবনার এই স্তর হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন—(১) ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, (২) ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ করা এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের সেবা করা, (৩) *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা, (৪) মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা এবং যদি সম্ভব হয় (৫) বৃন্দাবন অথবা মথুরা আদি স্থানে বাস করা। এই পাঁচটি অঙ্গের অনুশীলন ভক্তকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভে সাহায্য করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* এবং এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে স্বীকার করা হয়েছে যে, কনিষ্ঠ ভক্তও অজ্ঞাতসারে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৭

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তা-
মৈশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥

অথো—তার পর; **বিভূতিম্**—ঐশ্বর্য; **মম**—আমার; **মায়াবিনঃ**—মায়ার অধীশ্বর; **তাম্**—তা; **ঐশ্বর্যম্**—যোগ-সিদ্ধি; **অষ্ট-অঙ্গম্**—অষ্ট অঙ্গ-সমন্বিত; **অনুপ্রবৃত্তম্**—অনুসরণ করে; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ভাগবতীম্**—বৈকুণ্ঠের; **বা**—অথবা; **অস্পৃহয়ন্তি**—কামনা করে না; **ভদ্রাম্**—আনন্দময়; **পরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মে**—আমার; **তে**—সেই ভক্তেরা; **অশ্নুবতে**—উপভোগ করে; **তু**—কিন্তু; **লোকে**—এই জীবনে।

অনুবাদ

এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

মায়া প্রদত্ত *বিভূতি* বা ঐশ্বর্যসমূহ বিভিন্ন প্রকার। এই পৃথিবীতেও আমরা বিভিন্ন প্রকার জড়-জাগতিক সুখ উপভোগ করি, কিন্তু কেউ যদি চন্দ্রলোক, সূর্যলোক অথবা তার থেকেও উচ্চতর মহর্লোক, জনলোক, এবং তপোলোক, এমন কি ব্রহ্মার নিবাসস্থল সত্যলোকেও যান, সেখানেও জড় সুখভোগের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের আয়ু এখানকার মানুষদের থেকে অনেক অনেক বেশি। কথিত হয় যে, আমাদের ছয় মাসে চন্দ্রলোকের একদিন হয় এবং সেই অনুসারে সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু। সর্বোচ্চ লোকের অধিবাসীদের আয়ু আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার বার ঘণ্টা আমাদের গণিতজ্ঞদের কাছেও অচিন্তনীয়। এই সমস্ত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বা *মায়ার* বর্ণনা। এ ছাড়া, অন্যান্য অনেক ঐশ্বর্য রয়েছে, যা যোগীরা যোগ অনুশীলনের দ্বারা লাভ করতে পারেন। তবে সেইগুলিও ভৌতিক। ভক্ত কখনও এই সমস্ত ভৌতিক

ভোগের কামনা করেন না, যদিও তাঁরা ইচ্ছা করলেই সেইগুলি লাভ করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত ইচ্ছা মাত্রই আশ্চর্যজনক সফলতা লাভ করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত সেইগুলি কামনা করেন না। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য, খ্যাতি এবং সুন্দরী রমণীর সঙ্গ কামনা না করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন; ভক্তের একমাত্র বাসনা হওয়া উচিত ভগবানের সেবায় মগ্ন হওয়া, এমন কি তিনি মুক্তি লাভ করতে চান না, তা হলেও জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্ত ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকতে চান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ হয়ে গেছে। ভগবদ্ভক্তেরা উচ্চতর লোকের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করেন এমন কি বৈকুণ্ঠলোকেরও। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*ভাগবতীং ভদ্রাম্*। বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই নিত্যরূপে শান্তিময়, তবুও শুদ্ধ ভক্ত সেখানে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু তা হলেও তিনি সেই সুযোগ লাভ করেন; তিনি এই জীবনেই জড় জগতের এবং চিৎ-জগতের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করেন।

শ্লোক ৩৮

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

ন—না; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **মৎ-পরাঃ**—আমার ভক্তগণ; **শান্ত-রূপে**—হে মাতঃ; **নঙ্ক্ষ্যন্তি**—হারাবে; **ন**—না; **মে**—আমার; **অনিমিষঃ**—সময়; **লেঢ়ি**—ধ্বংস করে; **হেতিঃ**—অস্ত্র; **যেষাম্**—যাঁর; **অহম্**—আমি; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **আত্মা**—স্বীয়; **সুতঃ**—পুত্র; **চ**—এবং; **সখা**—বন্ধু; **গুরুঃ**—গুরু; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **দৈবম্**—দেবতা; **ইষ্টম্**—অভীষ্ট।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে মাতঃ! ভক্তেরা যে দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা কখনও নষ্ট হয় না; কোন রকম অস্ত্র এমন কি কালচক্রও সেই ঐশ্বর্য বিনষ্ট করতে পারে না। যেহেতু ভক্তেরা আমাকে তাঁদের সখা, আত্মীয়, পুত্র, গুরু, সুহৃৎ এবং ইষ্টদেবতা বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁদের ঐশ্বর্য থেকে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তার পুণ্য কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে এমন কি ব্রহ্মালোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্য কর্মের ফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে এসে নতুন জীবন শুরু করতে হয়। অতএব উচ্চতর লোকে উপভোগ এবং দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য উন্নীত হলেও, সেই অবস্থাটি স্থায়ী নয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের ক্ষেত্রে, তাঁদের সম্পত্তি—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য, এই লোকেও কখনও নষ্ট হয় না। এই শ্লোকে কপিলদেব তাঁর মাতাকে *শান্তরূপা* বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ভক্তের ঐশ্বর্য স্থির, কেননা ভক্তেরা বৈকুণ্ঠ পরিবেশে নিরন্তর স্থির থাকেন, যাকে বলা হয় *শান্তরূপ* কেননা তা শুদ্ধ সত্ত্ব, এবং জড়া প্রকৃতির রজোগুণ ও তমোগুণ তাকে বিচলিত করতে পারে না। কেউ যখন একবার ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় স্থির হন, তখন তাঁর দিব্য সেবার স্থিতি নষ্ট করা যায় না, এবং তাঁর আনন্দ এবং সেবা কেবল অন্তহীনরূপে বর্ধিতই হতে থাকে। বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণভাবনাযুক্ত ভক্তদের উপর কালের কোন প্রভাব পড়ে না। জড় জগতে কাল সব কিছুকে ধ্বংস করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে কাল এবং দেবতাদের কোন প্রভাব নেই, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে কোন দেবতা নেই। এখানে আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন বিভিন্ন দেবতারা; এমন কি আমার হাত ও পায়ের সঞ্চালনও দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে দেবতাদের অথবা কালের কোন প্রভাব নেই; তাই সেখানে ধ্বংসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে কাল রয়েছে, সেখানে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যেখানে কাল নেই—অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ নেই—সেখানে সব কিছুই নিত্য। তাই, এই শ্লোকে *ন নঙ্ক্ষ্যন্তি* শব্দটির ব্যবহার রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, চিন্ময় ঐশ্বর্য কখনও বিনষ্ট হবে না।

বিনষ্ট না হওয়ার কারণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের প্রিয়তম বলে স্বীকার করেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা প্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর প্রতি আচরণ করেন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধুরূপে, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে, প্রিয়তম পুত্ররূপে, প্রিয়তম গুরুরূপে, প্রিয়তম সুহৃৎরূপে অথবা প্রিয়তম ইষ্টদেবরূপে স্বীকার করেন। ভগবান নিত্য; তাই তাঁর সঙ্গে যে-সম্পর্ক স্থাপন হয়, তাও নিত্য। এখানে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে-সম্পর্ক, তার কখনও বিনাশ হয় না, এবং তাই সেই সম্পর্কের যে-ঐশ্বর্য, তাও কখনও বিনষ্ট হয় না। প্রতিটি জীবেরই ভালবাসার প্রবণতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, যার কোন প্রেমাস্পদ নেই, সে তার

ভালবাসার প্রবণতাকে সাধারণত বিড়াল-কুকুর আদি পোষা জন্তুদের উপর অর্পণ করে। এইভাবে সমস্ত জীবের ভালবাসার শাশ্বত প্রবণতা সর্বদাই প্রেমাস্পদের অন্বেষণ করে। এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানকে আমরা আমাদের পরম প্রেমাস্পদরূপে—সখারূপে, পুত্ররূপে, গুরুরূপে অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে ভালবাসতে পারি—এবং তাতে কোন রকম প্রতারণা নেই এবং সেই প্রেমের কোন অন্ত নেই। আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের আনন্দ বিভিন্নভাবে নিত্যকাল উপভোগ করতে পারি। এই শ্লোকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বলেছিলেন, এবং অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুরূপে স্বীকার করেছিলেন। তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে কেবল পরম গুরুরূপে বরণ করতে হবে।

কৃষ্ণ বলতে অবশ্য কৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গা ভক্তদের বোঝায়; কৃষ্ণ কখনই একলা থাকেন না। আমরা যখন কৃষ্ণের কথা বলি, 'কৃষ্ণ' বলতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের ধাম এবং কৃষ্ণের পরিকর সব কিছুকেই বোঝায়। কৃষ্ণ কখনই একা থাকেন না, কেননা কৃষ্ণভক্তেরা নির্বিশেষবাদী নন। যেমন একজন রাজা সর্বদাই তাঁর মন্ত্রী, তাঁর সেনাপতি, তাঁর সেবক এবং তাঁর সেবার সামগ্রী সহ থাকেন। যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পার্ষদ গুরুদেবকে স্বীকার করি, তখন আমাদের জ্ঞান কোন কলুষিত প্রভাবের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে না। জড় জগতে আমরা যে-জ্ঞান অর্জন করি, কালের প্রভাবে তা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সিদ্ধান্ত, যা আমরা *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি, তার কখনও কোন পরিবর্তন হতে পারে না। *ভগবদ্গীতার* অর্থ করার কোন প্রয়োজন নেই; তা নিত্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা উচিত। তিনি কখনও প্রতারণা করবেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের মিত্রবৎ উপদেশ প্রদান করবেন এবং মিত্রবৎ রক্ষা করবেন। কৃষ্ণকে যদি পুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, তা হলে কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। এখানে যখন কারও অত্যন্ত প্রিয় পুত্র অথবা সন্তান হয়, তখন পিতা-মাতা, অথবা তার প্রতি স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন, "আমার পুত্রের যেন মৃত্যু না হয়।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের কখনও মৃত্যু হবে না। তাই যাঁরা কৃষ্ণকে বা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনও তাঁদের সেই পুত্রকে হারাবেন না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পুত্ররূপে গ্রহণ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। বঙ্গদেশে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং এমন কি ভক্তের মৃত্যুর পর, শ্রীবিগ্রহ তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ সংস্কার সম্পন্ন করেছেন। এই

সম্পর্ক কখনও বিনষ্ট হয় না। মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে অভ্যস্ত, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* তার নিষেধ করা হয়েছে; তাই যথেষ্ট বুদ্ধির দ্বারা বিচারপূর্বক কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপের, যেমন—লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম এবং রাধা-কৃষ্ণেরই কেবল পূজা করা উচিত। তার ফলে মানুষ কখনও প্রতারিত হবে না। দেব-দেবীদের পূজা করার ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু জড় জগতের প্রলয়ের সময়, সেই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের লোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন, যেখানে কালের কোন প্রভাব নেই, এবং যেখানে প্রলয় বা বিনাশ নেই। অতএব চরমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন যে ভক্ত, তাঁর উপর কাল কখনই তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

শ্লোক ৩৯-৪০

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভযায়িনম্ ।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥ ৩৯ ॥
বিসৃজ্য সর্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্ ।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ ৪০ ॥

ইমম্—এই; **লোকম্**—জগৎ; **তথা**—অনুসারে; **এব**—নিশ্চয়ই; **অমুম্**—সেই জগৎ; **আত্মানম্**—সূক্ষ্ম দেহ; **উভয়**—উভয়; **অয়িনম্**—ভ্রমণ করে; **আত্মানম্**—দেহ; **অনু**—সম্পর্কে; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **ইহ**—এই জগতে; **যে**—যা কিছু; **রায়ঃ**—ঐশ্বর্য; **পশবঃ**—পশু; **গৃহাঃ**—গৃহ; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **সর্বান্**—সমস্ত; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বেশ্বর; **ভজন্তি**—আরাধনা করে; **অনন্যয়া**—অবিচলিতভাবে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **তান্**—তাঁদের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **অতিপারয়ে**—পার করি।

অনুবাদ

যাঁরা ইহলোকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পশু, গৃহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু, এমন কি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, অনন্য ভক্তি সহকারে সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বেশ্বর আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁদের সংসার-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাই।

তাৎপর্য

এই দুইটি শ্লোকে যেভাবে অনন্য ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় বা ভক্তি সহকারে, পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বস্ব বলে গ্রহণ করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া! যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুতে রয়েছেন, তাই অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা হলে, তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায় এবং অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যও সম্পাদিত হয়ে যায়। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর অপর পারে নিয়ে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা সংসার-সমুদ্রের পরপারে যেতে চান, তাঁদের যেন কোন রকম জড়-জাগতিক সম্পত্তি না থাকে। অর্থাৎ, তাঁরা যেন জাগতিক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, গৃহ, পশু ইত্যাদি জড়-জাগতিক সম্পদ সঞ্চয় করার মাধ্যমে এই জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা না করেন অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা না করেন।

শুদ্ধ ভক্ত যে কিভাবে অলক্ষিতভাবে মুক্তি লাভ করেন এবং তার লক্ষণ কি তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বদ্ধ জীবের অস্তিত্বের দুইটি অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা হচ্ছে ইহলোকে, এবং অন্যটি পরলোকে। কেউ যদি সত্ত্বগুণে থাকেন, তা হলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন, কেউ যদি রজোগুণে থাকেন তা হলে তাকে এখানেই থাকতে হবে, যে-সমাজ কর্মপ্রধান, এবং কেউ যদি তমোগুণে থাকেন, তা হলে তাকে পশু-জীবনে অথবা নিম্ন স্তরের মানব-জীবনে অধঃপতিত হতে হবে। কিন্তু ভক্তের ইহলোকের বা পরলোকের কোন চিন্তা নেই। কেননা তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তার জাগতিক উন্নতি সাধনের অথবা উচ্চ স্তরের বা নিম্নস্তরের জীবনের কোন বাসনা থাকে না। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—"হে প্রভু! কোথায় আমার জন্ম হবে তা নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি না, তবে আপনার ইচ্ছায় আমাকে যদি জন্ম গ্রহণ করতেই হয়, তবে অন্তত একটি পিপীলিকা রূপেও আমি যেন ভক্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করতে পারি।" শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করেন না। প্রকৃত পক্ষে, শুদ্ধ ভক্ত কখনও মনে করেন না যে, তিনি মুক্তি লাভের যোগ্য। তাঁর বিগত জীবন এবং দুষ্ট কর্মের কথা মনে করে, তিনি নিজেকে নরকের নিম্নতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন। এই জীবনে যদি আমি ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, তার অর্থ এই নয় যে, আমার পূর্ব জীবনে আমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলাম। তা সম্ভব নয়। তাই, ভক্ত সর্বদাই তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। তিনি মনে করেন যে, কেবল ভগবানের চরণে তাঁর

পূর্ণ শরণাগতির ফলে, ভগবানের কৃপায়, তাঁর ক্লেশ লাঘব হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* যে উল্লেখ করা হয়েছে—"আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ কর্ম থেকে রক্ষা করব"—সেটিই হচ্ছে ভগবানের কৃপা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তি তাঁর পূর্ব জন্মে কোন অন্যায় কর্ম করেননি। ভগবদ্ভক্ত সর্বদা প্রার্থনা করেন—"আমার পাপ কর্মের ফলে, আমি বার বার জন্ম গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমি যেন কখনও আপনার সেবার কথা ভুলে না যাই।" ভক্তের এতখানি মনোবল রয়েছে, এবং তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—"আমাকে যদি বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, সেই জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি, কিন্তু আমি যেন আপনার শুদ্ধ ভক্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করতে পারি, যাতে আমি পুনরায় নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাই।"

শুদ্ধ ভক্ত কখনও তাঁর পরবর্তী জন্মে নিজের উন্নতি সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন না। সেই প্রকার সমস্ত আশা তিনি ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন। গৃহস্থরূপে অথবা একটি পশুরূপে, যেই জীবনেই জন্ম হোক না কেন, কিছু না কিছু সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পত্তি থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সেইগুলির জন্য মোটেই আগ্রহী নন। ভগবানের কৃপায় তিনি যা লাভ করেছেন, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততির শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য মোটেই আসক্ত নন। তিনি তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করেন না—তিনি কর্তব্যপরায়ণ—তবে তিনি তাঁর অনিত্য গৃহস্থালির অথবা সমাজ-জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন না। তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে কেবল যতটুকু সময় একান্তই প্রয়োজন, ততটুকুই ব্যয় করেন (*যথার্হম্ উপযুঞ্জতঃ*)। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত এই জীবনে কি হবে অথবা পরবর্তী জীবনে কি হবে, তা চিন্তা করেন না; এমন কি তিনি তাঁর পরিবার, সন্তান-সন্ততি অথবা সমাজের কথা ভাবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তের দেহ ত্যাগের পর, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান আয়োজন করেন। দেহ ত্যাগের পর তাঁকে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় না। সাধারণ জীবেরা তাদের কর্ম অনুসারে, আর একটি শরীর ধারণের জন্য অন্য এক মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন, ভগবানের সঙ্গ করার জন্য। সেটিই হচ্ছে ভগবানের বিশেষ কৃপা। তা কিভাবে সম্ভব হবে তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে। ভগবান যেহেতু সর্ব শক্তিমান, তাই তাঁর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। তিনি সমস্ত পাপ কর্ম ক্ষমা করতে পারেন। তিনি যে-কোন ব্যক্তিকে নিমেষের মধ্যে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারেন। সেইটি হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি।

শ্লোক ৪১

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ ।
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥ ৪১ ॥

ন—না; **অন্যত্র**—অন্যথা; **মৎ**—আমি ভিন্ন; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরাৎ**—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই ঈশ্বর; **আত্মন্**—আত্মা; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ভয়ম্**—ভয়; **তীব্রম্**—ভয়ঙ্কর; **নিবর্ততে**—নিবৃত্তি হয়।

অনুবাদ

আমি ব্যতীত অন্য কারও শরণ গ্রহণ করার ফলে, কেউই ভীষণ জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি হচ্ছি সর্ব শক্তিমান, সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস, এবং সমস্ত আত্মার পরম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিবৃত্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বলা হয়েছে—*হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা যায় না। এখানেও সেই ধারণাই প্রতিপন্ন হয়েছে—কেউ তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা অবলম্বন করে অথবা যোগের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু যে যাই করুক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত না হলে, কোন পন্থাই তাকে মুক্তি দান করতে পারে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা হলে যারা এত কঠোরভাবে বিধি-বিধান পালন করে তপস্যা করছে এবং কৃচ্ছ্র সাধন করছে, তাদের কি সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ? তার উত্তর *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) দেওয়া হয়েছে—*যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ* । কৃষ্ণ যখন তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—"হে পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান! যারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে অথবা ভগবান হয়ে গেছে, কিন্তু এইভাবে চিন্তা

করা সত্ত্বেও তাদের বুদ্ধি প্রশংসনীয় নয়। তারা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন।" উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা, তা উন্নতই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, তা শুদ্ধ নয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে, জীব ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্যন্ত বিজ্ঞ পুরুষেরই শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হয়। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে* —বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।

শরণাগতির পন্থা ব্যতীত, মুক্তি লাভ করা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"যারা ভক্তিবিহীন পন্থা অবলম্বন করে, অহঙ্কারাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, তারা মার্জিত অথবা নির্মল বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, কেননা তারা এখনও আপনার শরণাগত হয়নি। নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মানুভূতির কিনারে আসা সত্ত্বেও, তারা মনে করে যে, তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, যেহেতু তারা চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেনি, তাই তারা পুনরায় জড় কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হয়।" নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানার মাধ্যমেই কেবল সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাকে অবশ্যই পরমব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হতে হবে; সেটিই হচ্ছে ভক্তি। ব্রহ্মের কর্তব্য হচ্ছে পরমব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। বলা হয় যে, ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মের সেবা করা যায় না। পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং জীবও ব্রহ্ম। নিজেকে ব্রহ্ম, চিন্ময় আত্মা, ভগবানের নিত্য সেবক বলে উপলব্ধি না করে, কেউ যদি কেবল নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করে, তা হলে সেইটি কেবল পুঁথিগত জ্ঞান। তাকে সেই সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে; তা হলেই কেবল সে ব্রহ্মপদে স্থিত হতে পারবে। তা না হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অভক্তেরা যেহেতু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা উপেক্ষা করে, তাই তাদের বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়, এবং সেই জন্য তাদের অধঃপতন হয়। কর্ম করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। সে যদি চিন্ময় কর্মে যুক্ত না হয়, তা হলে তাকে জড় জগতের কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হতে হবে। যখনই কেউ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অধঃপতিত হয়, তখন তার পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে কপিলদেব সেই কথাই বলেছেন—"আমার কৃপা ব্যতীত" (*নান্যত্র মদ্ভগবতঃ*)। এখানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং তাই তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে জীবকে উদ্ধার করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তাঁকে এখানে ভগবানও বলা হয়েছে কেননা তিনি হচ্ছেন পরম। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী,

কিন্তু যিনি তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। *ভগবদ্গীতায়* এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়। কিন্তু যিনি তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুকূল। কেবল মাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায়, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তা না হলে, মুক্তির অন্যান্য পন্থা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনুশীলন করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ৪২

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

মৎ-ভয়াৎ—আমার ভয়ে; **বাতি**—প্রবাহিত হয়; **বাতঃ**—বায়ু; **অয়ম্**—এই; **সূর্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—কিরণ বিতরণ করে; **মৎ-ভয়াৎ**—আমার ভয়ে; **বর্ষতি**—বর্ষণ করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **দহতি**—দহন করে; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চরতি**—বিচরণ করে; **মৎ-ভয়াৎ**—আমার ভয়ে।

অনুবাদ

আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, মেঘের রাজা ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রকৃতির নিয়মগুলি তাঁরই অধ্যক্ষতার ফলে সঠিকভাবে কার্য করে। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, প্রকৃতি কারও অধ্যক্ষতা ব্যতীতই আপনা থেকে কাজ করছে। বৈদিক শাস্ত্র বলে যে, মেঘ ইন্দ্রদেব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সূর্যদেব তাপ বিতরণ করে, চন্দ্রদেব স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করে, এবং পবনদেবের ব্যবস্থাপনায় বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু সর্বোপরি এই সমস্ত দেবতাদের মধ্যে রয়েছেন সর্ব প্রধান পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। দেবতারাও সাধারণ জীবাত্মা, কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা এবং ভক্তির ফলে, তাঁরা এই সমস্ত পদে নিযুক্ত হয়েছেন। চন্দ্র, বরুণ, বায়ু আদি বিভিন্ন দেবতা বা পরিচালকদের বলা হয় *অধিকারি-দেবতা*। দেবতারা হচ্ছেন বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্র কেবল একটি দুইটি গ্রহকে নিয়েই নয়; কোটি-কোটি গ্রহ এবং কোটি-কোটি

ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্র বিশাল, এবং তাঁর সহকারীর প্রয়োজন হয়। দেবতাদের তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এইগুলি বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। এই পরিস্থিতিতে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব এবং বায়ুদেব পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় কার্য করছে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। প্রকৃতির নিয়মগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু সব কিছুর পিছনে তিনি রয়েছেন, তাই সব কিছু যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে সম্পন্ন হচ্ছে।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি অন্য সমস্ত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। তখন তাকে আর অন্য কারও সেবা করতে হয় না অথবা অন্য কারও কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় না। অবশ্য তা বলে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করেন না, পক্ষান্তরে তার সমস্ত চিন্তা এবং শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকে। ভগবান কপিলদেবের এই উক্তি, তাঁর নির্দেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি দহন করে, সূর্য তাপ বিতরণ করে, তা ভাবপ্রবণতা নয়। নির্বিশেষবাদীরা বলতে পারে যে, *ভাগবতের* ভক্তেরা তাঁদের কল্পনায় ভগবানকে সৃষ্টি করে এবং তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণ আরোপ করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কল্পনা নয় এবং ভগবানের নামে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন গুণ এবং শক্তি আরোপ করা হয় না। *বেদে* বলা হয়েছে, *ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে/ভীষোদেতি সূর্যঃ*—"পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে পবনদেব এবং সূর্যদেব কার্য করছে।" *ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ / মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ*—"অগ্নি, ইন্দ্র এবং মৃত্যু সকলেই তাঁর পরিচালনায় কার্য করছেন।" এইগুলি বেদের বাণী।

শ্লোক ৪৩

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তেন**—যুক্ত; **ভক্তি-যোগেন্**—ভক্তির দ্বারা; **যোগিন**—যোগীগণ; **ক্ষেমায়**—শাশ্বত লাভের জন্য; **পাদ-মূলম্**—চরণ; **মে**—আমার; **প্রবিশন্তি**—শরণ গ্রহণ করে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

যোগীগণ তাঁদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগে আমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁরা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী। এখানে *যুক্তেন ভক্তিযোগেন* শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সমস্ত যোগী ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বোত্তম যোগী। *ভগবদ্গীতায়* এই সর্বোত্তম যোগীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। এই সমস্ত যোগীরা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-বিহীন নন। ভক্তিযোগী আপনা থেকেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেন। সেইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের আনুষঙ্গিক ফল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি ভক্তি সহকারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেছেন, এবং কিভাবে যে তা লাভ হয়, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। *অহৈতুকী*—অর্থাৎ বিনা কারণে তা লাভ হয়। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরও হয়, ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে, শাস্ত্রের দিব্য জ্ঞান তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রেও সেই কথা বলা হয়েছে। যিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁর কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম প্রকাশিত হয়। তাঁকে পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না; যে যোগী ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ বৈরাগ্য অর্জন করেছেন। যদি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর ভক্তি পূর্ণ হয়নি। মূল কথা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত চিৎ-জগতে—ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা সেই ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা যায় না। ভগবানের চরণে যাঁরা শরণাগত, তাঁদের বলা হয় *অকুতোভয়*। তাঁরা নিঃসংশয় এবং নির্ভয়, এবং ভগবদ্ধামে তাঁদের প্রবেশ নিশ্চিত।

শ্লোক ৪৪

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৪ ॥

এতাবান্ এব—এই পর্যন্ত; **লোকে অস্মিন্**—এই জগতে; **পুংসাম্**—মানুষদের; **নিঃশ্রেয়স**—জীবের অন্তিম সিদ্ধি; **উদয়ঃ**—প্রাপ্তি; **তীব্রেণ**—তীব্র; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **স্থিরম্**—স্থির হয়।

অনুবাদ

তাই যাঁদের মন ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়ে স্থির হয়েছে, তাঁরাই সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন। জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সেটিই একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

এখানে *মনো ময্যর্পিতম্*, যার অর্থ হচ্ছে 'মন আমাতে স্থির হওয়ায়', শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অবতারের শ্রীপাদপদ্মে তার মনকে স্থির করা। সুদৃঢ়ভাবে তাতে মনকে স্থির করাই মুক্তির উপায়। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে অম্বরীষ মহারাজ। তিনি তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেছিলেন, তিনি কেবল ভগবানের লীলা-বিলাসের কথাই বলতেন, তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসী এবং পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তিনি কেবল ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার জন্যই পায়ে হাঁটতেন, তিনি তাঁর হাতগুলি ভগবানের মন্দির মার্জনের জন্য ব্যবহার করতেন, তিনি তাঁর জিহ্বাকে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনে যুক্ত করতেন, এবং তিনি তাঁর কান দিয়ে ভগবানের মহান লীলা-বিলাসের বর্ণনা শুনতেন। এইভাবে তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিল। সর্ব প্রথমে মনকে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করতে হয়। মন যেহেতু সব কটি ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তাই মন যখন যুক্ত হয়, তখন সব কটি ইন্দ্রিয়ও যুক্ত হয়। সেটিই হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। যোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; সেইগুলি সর্বদাই অত্যন্ত উত্তেজিত। একটি শিশুর ক্ষেত্রেও সেইটি সত্য—কতক্ষণ জোর করে তাকে এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখা যায়? তা সম্ভব নয়। অর্জুনও বলেছেন, *চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ*—"মন সর্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল।" মনকে স্থির করার সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাকে অর্পণ করা। *মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্*। কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হন, সেইটি হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কৃষ্ণভাবনায় সমস্ত কর্মই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ভক্তির মহিমা' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।